বেঙ্গল পাব্লিশার্স-এর পক্ষে
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ
বৈশাখ
১৩৫০

দি প্রিন্টিং হাউস-এর পক্ষে
মুদ্রাকর—শ্রীপুলিনবিহারী সামন্ত
৭০, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।



[দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মাঝখানে প্রাচীর ঘেরা একটি দোতলা বাগানবাড়ী। কোলাপ্সিবল গেট আঁটা বারান্দার সামনের দিককার একতলা ঘর। সকাল বেলা—সঞ্জয় ও অশ্বিনী কথাবার্ত্তা কইছে। সঞ্জয়ের বয়স পঁচিশ, সুশ্রী একাহারা চেহারা—অশ্বিনীর বয়স বছর তিরিশ, পোষাক আধা-ভৃত্য গোছের।]

সঞ্জয়। হ্যাঁ, কি বললে তোমার নাম? অম্বিকা না অক্ষয়···

অশ্বিনী। আজ্ঞে অশ্বিনী।

সঞ্জয়। তা দেখো অশ্বিনী, আমার ত আর এখানে থাকা চলে না। যে ড্যাম্প ঘর, এক রাত্রেই আমার সর্দ্দি লেগে গেছে—গা-টাও কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে, হয়ত জ্বরই হবে।

অশ্বিনী। আজ্ঞে তা হতে পারে। এখানে যে সব বাবু আসেন, প্রথম এক চোট তাঁদের সবারই জ্বর হয়।

সঞ্জয়। বলো কি হে? পয়সা দিয়ে লোকে এই দুর্ভোগ ভুগতে আসে এখানে?

অশ্বিনী। উপায় কি বলুন? শহর থেকে বাইরে বেরুবার একমাত্র পাকা সড়ক এবং তার ওপর একমাত্র হোটেল—সৌখীন বাবু যাঁরা মেমসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরোন, তাঁদের আর ত আশ্রয় নেই!

সঞ্জয়। কিন্তু তোমাদের এখানে ত আবার অদ্ভুত নিয়ম। কাল বিকেলে এসেছি, সেই যে আমার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে মেয়েমহলে বস্তাবন্দী করলে, আর ত তাঁর টিকিটি দেখতে পেলাম না।

অশ্বিনী। কি করবেন বলুন, যেখানকার যা নিয়ম। বলে না, যস্মিন দেশে···

সঞ্জয়। তা ত বলে, কিন্তু এই অদ্ভুত নিয়মের মানেটা কি?

অশ্বিনী। আজ্ঞে, আমাদের কর্তাটি আইবুড়ো কিনা, তাঁর ধারণা যে বেশীর ভাগ বাবুই বিয়ে না-করা পরিবার নিয়ে এখানে আসেন—তাই তিনি এক দফা পরীক্ষা না করে কোন স্বামী-স্ত্রীকেই এক জায়গায় থাকতে দেন না।

সঞ্জয়। বটে? তা পরীক্ষাটা তিনি করেন কি করে?

অশ্বিনী। দেখতেই পাচ্ছেন। দু'জনকে দু'জায়গায় চালিয়ে দেন—তারপর দু'জনের হয় সর্দ্দি, কাসি, জ্বর, তখন একটু চাপ দিলেই আসল ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ে। যদি প্রমাণ হয় যে ভেতরে কিছু গোলমাল আছে, তাহলে··

সঞ্জয়। তাহলে?

অশ্বিনী। তাহলে সে অনেক কাণ্ড বাবু। কিন্তু আপনার আর তাঁতে যাচ্ছে-আসছে কি? আপনি ত বিয়ে-করা পরিবার নিয়েই এসেছেন। আপনাকে হয়ত কর্ত্তা ও-বেলাই দোতলায় থাকবার হুকুম দেবেন, আর কালই হয়ত আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখাও হতে পারবে।

সঞ্জয়। দেখো বাপু অশ্বিনী, আমি তোমার কর্ত্তার খাসমহালের প্রজা নই। পয়সা দিয়ে হোটেলে থাকবো, আমি অত আইন-কানুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধার ধারি না। আমি আজই চলে যাবো—তুমি বলোগে, আমি দু'হপ্তা থাকার যে চুক্তি করেছিলাম, তা বাতিল করছি।

অশ্বিনী। আজ্ঞে সেটি হবে না। দু'হপ্তার আগে আপনি চলে যাওয়া ত দূরের কথা, এই ঠাণ্ডি মহলের বাইরেই যেতে পারবেন না বাবুমশায়। এ তল্লাট হল কর্ত্তার খাসমহালই, এখানে তাঁর ইচ্ছেই আইন, আর সে আইন না মানলে তার পরিণাম বড়ই ভয়ানক হয় বাবু!

সঞ্জয়। কি বলছো তুমি? এ কি মগের মল্লুক নাকি? আমার পোষায় থাকবো, না পোষায় চলে যাবো, এর ভেতর···

আশ্বিনী। ঐ ত বললাম বাবু যে কর্ত্তার ইচ্ছেই আইন। এই যে শহর

ছাড়িয়ে এতটা পথ এলেন, এর ভেতর আর কোন মানুষের বাড়ী দেখলেন কি? আরো এতটা গেলে তবে পাবেন মেমনগর। এই প্রকাণ্ড তল্লাট সবই হল উজাড় গাঁ, এখানে কর্ত্তাই হলেন রাজা, বাদশা, বিধাতা—বুঝেছেন!

সঞ্জয়। তাহলে কি আমি না বুঝে কোন শয়তানের ফাঁদে পা দিয়েছি?

অশ্বিনী। আজ্ঞে না। কর্ত্তা আমাদের দেবতা—দুটো দিন যেতে দিন, দেখবেন, ক্রেমে ক্রেমে আপনার আদর-যত্ন বাড়তে স্বরু করেছে। যাবার সময় আপনার বিছানা-বাক্স জিনিষপত্র সবই ফেরৎ পাবেন।

সঞ্জয়। আর আমার স্ত্রী?

অশ্বিনী। সে সম্বন্ধেও কোন ভাবনা নেই আপনার। কর্ত্তা ও-দিক থেকে একেবারে ভীষ্ম বললেই চলে।

সঞ্জয়। কিন্তু তাঁর এই বেয়াড়া খেয়ালের মানেটা কি?

অশ্বিনী। মানে? মানেটা তিনিই বুঝিয়ে দেবেন বাবু। তা হ্যাঁ, কি জন্যে ডেকেছিলেন আমায়?

সঞ্জয়। চা, চা পাওয়া যাবে ত এক কাপ? ঘুম থেকে উঠে চা না হলে আমার দম আটকে আসে। তার ওপর সারারাত্রি তোমার ঠাণ্ডি গারদে বন্দী থেকে হাত-পা গেছে অসাড় হয়ে।

অশ্বিনী। চা ত পাবেন না বাবু, আজ এ-বেলা ভাতও পাবেন না আপনি। এক বোতল নিমের আরক আর এক বাটি নুন জল, এই দেওয়া হবে আপনাকে—তারপর ও-বেলা অন্য ব্যবস্থা।

সঞ্জয়। সে কি? তোমরা কি আমায় খুন করতে চাও? কি করেছি আমি তোমাদের? আমাকে সপরিবারে···

অশ্বিনী। ভয় নেই বাবু, নিমের আরক খাসা জিনিষ। পেটে পড়লে যেমন পিত্ত দমন করে, তেমনি শ্লেষ্মা কমায়, আর ক্ষিধে বাড়াতে ত ওর জুড়ী ওষুধ দুনিয়াতেই নেই। নুন জল ত জানেনই···তা ওরে বাসুদেব!

[বাসুদেবের প্রবেশ]

বাসুদেব। কি ?

অশ্বিনী। দে বাবুকে একখানা চটের গামছা, একটা পেয়ারার ডাল, এক বাটি নুন জল, আর এক বোতল···

সঞ্জয়। নিমের আরক ! রক্ষা করো বাবা, তার চেয়ে একখানা ছুরি দাও, গলায় বসিয়ে দিই। তা আমার বিছানা বাক্স জিনিষপত্র···

অশ্বিনী। কোথায় সে সব ?

বাসুদেব। গুদামে তালাবন্ধ।

অশ্বিনী। দেখেছেন কি রকম সুবন্দোবস্ত ! যাবার সময় সব কড়া-ক্রান্তি বুঝিয়ে ফেরৎ দেওয়া হবে আপনাকে।

সঞ্জয়। এখন চটের গামছা আর ভাঙা হাঁড়িতেই কাজ সারতে হবে !

অশ্বিনী। অনেকটা তাই।

সঞ্জয়। ও কি ? এই নরকের ভেতর আবার গান গায় কে ?

অশ্বিনী। ও ভারতী দিদি।

সঞ্জয়। তিনিও কি তোমাদের বন্দী ?

অশ্বিনী। অনেকটা।

[ভেতরে ভারতীর গান]

আমি উষার শিয়রে জেগে রই।
আমি দিগন্তে আঁকি সোনার স্বপন,
বাতাসে বাতাসে কথা কই।
আমি ফুল-কলিদের প্রাণ গো,
গাই ঘুম-ভাঙানোর গান গো—
আমি রাতের সিঁথায় সোহাগ সিঁদুর,
আমি প্রভাতের সই ॥

সঞ্জয়। চমৎকার! তা এমন একটি গায়িকাকেও তোমাদের কর্ত্তা আটকে রেখেছেন? ওঁর বয়স কত?

অশ্বিনী। কত আর, বছর বাইশ হবে।

সঞ্জয়। কি বলে গিয়ে···

অশ্বিনী। বলুন—চেহারা? সে যদি দেখেন ত অবাক হয়ে যাবেন বাবু। উর্ব্বশীও বলতে পারেন, অন্নপূর্ণাও বলতে পারেন, তার ওপর এই গলা!

সঞ্জয়। উঃ কি ভয়ঙ্কর লোক তোমাদের এই কর্ত্তাটি!

অশ্বিনী। তা একটু বৈ কি।

সঞ্জয়। ক্ষমতা থাকলে ওঁকে আমি উদ্ধার করতাম!

অশ্বিনী। ও কথাটি মুখেও আনবেন না বাবু। তাহলে ধড়ে আর মাথা থাকবে না! তবে হ্যাঁ, ইচ্ছে করেন ত ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারেন, চাই কি গানও শুনতে পারেন ওঁর।

সঞ্জয়। তাতে তোমাদের···

অশ্বিনী। কর্ত্তার কিচ্ছু আপত্তি নেই। ওই যে বলেছি, কর্ত্তা আমাদের দেবতা। আচ্ছা, তার ব্যবস্থা করছি আমি। আপনি ততক্ষণ মুখ-হাত ধুয়ে পাঁচনটা খেয়ে নিন। আমরা এখন চলছি—বোতাম টিপলেই আসবো আবার।

[দু'জনে চলে গেল। সঞ্জয় একা ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে লাগলো। ভেতরে তখন আবার ভারতীর গান হচ্ছে—সঞ্জয় উৎসুক হয়ে শুনতে লাগলো।]

[ঐ বাড়ীর অন্দর মহল। পর্দ্দা ঘেরা বারান্দার একটি ঘরে ছন্দা ও ভারতী। ছন্দার বয়স বছর সাতাশ, পোষাক আধুনিক—ভারতীর বয়স কুড়ি-একুশ, পোষাক অতি-আধুনিক। সময় দুপুর।]

ছন্দা। গুন গুন করে কেন, গলা ছেড়েই গাও না ভাই। এই ঠাণ্ডি গারদে তোমার গান শুনলে তবু মনে হয় বেঁচে আছি!

ভারতী। আচ্ছা শোনো—

উতলা নিশীথ কি কথা কয়!
ফোটা ফুলের ললাটে চুমো দিয়ে চুপিচুপি,
পা টিপে পিয়াসী বায়ু বয়।
তিমির পুঞ্জিত ঘন বনতলে,
জোনাকির চোখে কি স্বপন দোলে,
ঝুরে ঝিঁঝিঁর নূপুরে ঘুমের মদিরা
রিমিঝিমি রুমুঝুমু বনময়॥
নিভায়ে দাও বাতি প্রাসাদ-বাতায়নে,
বাহিরে কাঁদে চাঁদ পাংশু ঝাউবনে,
ম্লান জ্যোছনালোকে, শোনো না গাহে ও কে,
রুদ্ধ গৃহ-কোণে আর কি থাকা সয়॥

ছন্দা। চমৎকার! কার লেখা ভাই?

ভারতী। সেই সর্ব্বনাশা লোকটার।

ছন্দা। তাই নাকি? আচ্ছা, তার সম্বন্ধে তোমার মনে বোধহয় আর কোন মোহ নেই!

ভারতী। একদম না, এক ফোঁটাও না।

ছন্দা। অথচ ক'দিন আগে ত তারি সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলে—বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে, মান-সম্ভ্রম ভুলে, ভবিষ্যৎ না ভেবে!

ভারতী। শুধু তাই! বয়সে সে আমার চেয়ে কুড়ি বছরের বড় এবং তার স্ত্রী আছে জেনে এবং তার স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় বুঝে। কেমন একটা নেশায় পেয়ে বসেছিল যেন! মনে হয়েছিল, কি এমন দাম এই জীবনটার

যে এ থেকে বঞ্চিত করে বেচারীকে এত দুঃখ দোব? কিন্তু আশ্চর্য্য, আজ আর তার কথা মনেই স্থান পায় না! বিরক্তি নয়, রীতিমতো ঘেন্নাই হয় যেন লোকটার ওপর।

ছন্দা। কি করে হল ভাই এটা?

ভারতী। ক'দিন সর্দ্দি-জ্বরে ভুগে, আর ঐ বিশ্রী বোতল খেয়েই বোধ হয় মনটা একদম পরিষ্কার হয়ে গেল। খুব সম্ভব প্রেম জিনিষটা একটা বায়ুর ব্যাপার—ওটা দমন করতে শ্লেষ্মা দরকার। যাই বলো, এই বেয়াড়া কর্ত্তাটা ধরেছে ঠিক।

ছন্দা। সত্যি ভাই! আমারও এখন ধারণা হয়েছে, ভুলই করেছি। একটা সদ্য পাশকরা গোঁফ-ছাঁটা ছোকরার কথার চটকে ভুলে কুলে কালি দেওয়া—ছি ছি! ভাগ্যিস ঠিক সময়ে ধরা পড়েছিলাম এখানে, নইলে গড়াতে গড়াতে কোথায় যে গিয়ে পড়তাম কে জানে!

ভারতী। কি করে তোমাদের সম্পর্ক হল ভাই? আমি না হয় গান শিখতে গিয়ে মরেছিলাম। তুমি ত বৌ মানুষ!

ছন্দা। ওঁর ত আমার ওপর ছিল না এক বিন্দু নজর—কে এক ব্যারিষ্টারের মেয়ে, এক আইবুড়ো ধাড়ী ছিল ওঁর ভক্ত, তারি পিছু পিছু ঘুরতেন। দেখে দেখে মন আমার বিগড়ে গেল—বাপের বাড়ী চলে গেলাম জব্দ করার জন্যে। সেই সুযোগে হতভাগা টোপ ফেলতে সুরু করলো—তারপর কি মতি হল, এক রাত্রে কিছু টাকা আর জিনিষপত্র নিয়ে ওর সঙ্গে পাড়ি দিলাম। তারপর···

ভারতী। তারপরের ব্যাপার ত আমার জানা। ঠাণ্ডি গারদ, নিমের পাঁচন, গুড়-উচ্ছের পায়েস, অর্দ্ধেক রাত্রে মুখ-বাঁধা ডাক্তার, আর তার সেই বিদঘুটে চিকিৎসা!

ছন্দা। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অদ্ভুত! আমার এক একবার মনে হচ্ছে, যেন একটা বাঁধা প্ল্যানের ভেতর এসে পড়েছি।

ভারতী। আমারও তাই! আচ্ছা সহর থেকে বেরিয়ে মেমনগরের পথে এসেই তোমরা…

ছন্দা। একখানি ট্যাক্সি, আর একটি দোকান ত? দেখেছি বৈকি। ভাড়া ঠিক করে গাড়ীতে ওঠামাত্র ড্রাইভার এক ঠোঙা খাবার আর এক থান সিঁদুর এনে দিলে—বললে, দাম ভাড়ার মধ্যে!

ভারতী। তারপর এই বাড়ীর কাছে এসেই বললে, গাড়ীতে আর তেল নেই, এই হোটেলে…

ছন্দা। রাত কাটিয়ে, সকালে আর একখানা গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে যাবেন।

ভারতী। তারপরেই এলো অশ্বিনী, ভাড়া দিতে দিল না ট্যাক্সির—বললে, ওটা চার্জ্জের মধ্যে!

ছন্দা। হুবহু এক! ব্যাপার কি ভাই? এই কর্ত্তা লোকটি কে, কি করেই করেই বা সে টের পায়, ছেলে-মেয়েরা পালিয়ে আসচে?

ভারতী। সেটা বোঝা যায় বৈকি কিছু কিছু। দেখো, সহর থেকে জানা-শোনা এড়িয়ে হাঁটা পথে একটু বেশী দূর পালাতে হলে লোকে মেমনগরের পথে আসবেই, কাজেই এক জোড়া ছেলে-মেয়েকে এই পথে দেখলে সকলেই সন্দেহ করতে পারে—এরা প্রেমে পড়েছে। আরো ভালো করে সেটা পরখ করা যায় সিঁদুর বিলি করে, আর ট্যাক্সি জোগান দিয়ে।

ছন্দা। তারপর ঠাণ্ডি গারদে রেখে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ফেলে, আর সেই অসুখের ভেতর কি একটা আবোল-তাবোল ব্যাপার করে, মনের ভেতরটা বোধহয় উল্টে পাল্টে দেয়।

ভারতী। মনে ত হচ্ছে!

ছন্দা। কিন্তু এতে স্বার্থ কি লোকটার? হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে রোজ প্রেম করছে, লাখ লাখ যাচ্ছে জাহান্নামে—তাতে তার কি গেল এলো? লোকটা একটা দুষমন নয়ত! মেয়ে বিক্রীর ব্যবসা করে…

ভারতী। কে জানে ভাই! সময় সময় বড্ড ভয় করে। তবে একটা যে মস্ত বিপদ থেকে আপাতত বেঁচে গেছি, এ কিন্তু না স্বীকার করে পারি না।

ছন্দা। তা ঠিক। তবে বাঘের হাত থেকে ভালুকের হাতে পড়ে থাকি যদি—যদি মনে করো, অর্দ্ধেক রাত্রে মুখ বেঁধে আফ্রিকায়, নয়ত চীনে চালান করে দেয়!

ভারতী। বলো না ভাই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে! এই যে নলিনী আসছে। কি খবর নলিনী?

[নলিনীর প্রবেশ]

নলিনী। কর্ত্তার হুকুম, ছন্দা দিদিমণিকে এখুনি ওপরে চলে যেতে হবে।

ছন্দা। আচ্ছা নলিনী, তোমাদের এখানে সব শুদ্ধ কত বাবু আর কত বিবি আছে?

নলিনী। তা দিদিমণি অনেক। গুণে ত দেখিনি। কতক কাবার হচ্ছে, আবার নতুন আসছে—এ ত আনাগোনার মেলা কি না!

ভারতী। কাবার কি গো? তোমাদের কর্ত্তাটি ডাকাত নাকি?

নলিনী। ডাকাত কেন হবেন? ডাক্তার।

ভারতী। আচ্ছা নলিনী, বলতে পারো তোমাদের কর্ত্তা কি জন্যে নিরীহ লোকদের রাস্তা থেকে তাড়িয়ে এনে ঘরে পুরে এমন ধারা সাজা করেন? এই কি তাঁর ব্যবসা?

নলিনী। মোটেই না দিদিমণি, কর্ত্তার বড় দয়ার শরীর—একেবারে ঠাকুর বললেই হয়। যখন দেখাশোনা হবে, অবাক হয়ে যাবেন। তিনি লোকের ভালোর জন্যেই এই মাঠের মধ্যে পড়ে আছেন, আর দিন-রাত্তির এত মেহনৎ করছেন। কিন্তু আর দেরী করবেন না দিদি। আপনাকে ওপরে পৌঁছে দিয়ে আমায় আবার যেতে হবে কর্ত্তার কাছে, আপনাদের খাবার ব্যবস্থা জানা হয় নি এখনো।

ছন্দা। আজ আবার কি দেবে? ঘৃতকুমারী ভাজা আর গুলঞ্চর চচ্চড়ি নাকি?

নলিনী। হেঁ হেঁ দিদি, ঠিক ধরেছেন আপনি। বড় সুখাদ্য ওসব—কর্ত্তা ভারী পছন্দ করেন!

ভারতী। আচ্ছা নলিনী, তোমার চেহারা খানা ত বেশ। কিন্তু গলাটা এমন বিশ্রী কেন? যেন একটুও রস-কষ নেই!

নলিনী। রস, দিদি, বয়সকালে রস খুবই ছিল। এক আঁটকুড়োর পাল্লায় পড়ে দিন-রাত্তির চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলার দশা ঐ হয়েছে। তারপর মিন্সে মরতে হাড়ে বাতাস লেগেছে।

ভারতী। তোমার বর নাকি?

নলিনী। পোড়া কপাল আমার! বর হলে আর এখানে এসে জুটবো কেন? বর নিয়ে যারা বেরোয়, তারা কি আর মেমনগরের রাস্তায় পা দেয়? তারা যায় সদর এষ্টেসনে—কি বলো দিদি?

ছন্দা। আচ্ছা চলো কোথায় যেতে হবে। তা ভাই ভারতী··

ভারতী। যাবো, যাবো, গান শুনিয়ে আসবো তোমায়।

[দু'জনে পরদা সরিয়ে ওপরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। উল্টো দিকের দরজা খুললো—এসে ঢুকলো সঞ্জয়।]

সঞ্জয়। যাই হক, ভেবেছিলাম, বনের পাখী বুঝি বনেই লুকালো—আর তার দেখা পাবো না।

ভারতী। না পেলেই বা ক্ষতি কি ছিল?

সঞ্জয়। ক্ষতি? ভারতী, কি করে বোঝাবো তোমায়, কি ক্ষতি ছিল? এই যে আজ দস্যুর হাতে বন্দী হয়েছি, দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি—তবু, তবু এরি ভেতর তুমি নিয়ে এসেছো অপূর্ব্ব একটা জীবনের

স্বাদ, তোমারি আলোয় নূতন করে আজ আবিষ্কার করেছি নিজেকে। বুঝেছি, সৌন্দর্য্য কি, প্রেম কাকে বলে, কিসের পায়ে যুগ যুগ ধরে মানুষ দিয়েছে পূজার অর্ঘ্য! আজ সত্যিই জেগেছে তীব্র একটা বাঁচার ইচ্ছে এবং সে ইচ্ছে তোমারি জন্যে ভারতী!

ভারতী। বটে? তাহলে ত আমি মস্ত একটা কাজ করেছি বলতে হবে। তা আপনার হাতে কবিতা-টবিতা আসে না? লিখুন না আমাকে নিয়ে একখানা মহাকাব্য!

সঞ্জয়। ঠাট্টা করছো ভারতী?

ভারতী। রামো, ঠাট্টা করতে পারি? মাত্র তিন দিন আগে এসেছিলেন এক গেরস্তর বৌকে নিয়ে পালিয়ে, এরি মধ্যে তিনি গেলেন কোন রসাতলে তলিয়ে, আর দু'দিন দশ মিনিটের আলাপেই আর একজন হয়ে উঠলেন আপনার যুগ যুগান্তের প্রিয়া, জন্ম-জন্মান্তরের মানসী! জানি না আপনাদের পুরুষের ভাষায় একে কি বলে। আমরা মেয়েরা কিন্তু একে বলি ন্যাকামি!

সঞ্জয়। উঃ ভারতী, এমন তোমার রূপ—এত সুকুমার তোমার দেহ, কিন্তু এত কঠিন তোমার হৃদয়! আমার যন্ত্রণা নিয়ে তুমি রঙ্গ করছো!

ভারতী। না ত। কিন্তু যাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন এবং শেষটা মেয়ে ব্যবসায়ীর খপ্পরে যাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ভালোমানুষটি সেজে বসেছেন, তাকেও ত ঠিক এম্নি করেই বলেছিলেন এই সব কথা।

সঞ্জয়। হয়ত বলেছিলাম, কিন্তু তখন নিজেকে বুঝি নি। তাই সে কথা বলেছিলাম মুখ দিয়ে, মন দিয়ে বলি নি। কি একটা দুর্ব্বোধ নেশার টানে চোখ-কান বুঁজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম দুর্গমে—যদি বাধা না পেতাম, হয়ত বয়ে চলতাম সেই বোঝা অনেক দিনই, কিন্তু মন তার সমস্ত রং হারিয়ে

মাঝপথেই পড়তো দেউলে হয়ে। সে হত আরো বড় বিড়ম্বনা। বাধা পেয়েই বুঝলাম, সে আলো নয়, আলেয়া, সে মেকি!

ভারতী। নিমের আরকের ক্ষমতা আছে ত তাহলে! কিন্তু আবার যে সেই দশাই হবে না কোন দিন, তা কে বলতে পারে? বিশেষ করে প্রাণ দেবার জন্যে যারা প্রাণটি হাতে নিয়েই বসে আছে, তাদের ওপর ভরসা কি? শেষটা সেই বেচারীর মতো আবার···

সঞ্জয়। উঃ, আচ্ছা, আচ্ছা ভারতী। আর কিছুই বলবো না আমি—হাতে হাতেই প্রমাণ দিয়েছি নিজের অবিশ্বাসিতার, কি করে আর বিশ্বাস দাবী করবো তোমার কাছে? কিন্তু ভারতী, ভুল ত তুমিও করেছিলে, নইলে এখানে আসবে কেন?

ভারতী। তা বটে! কিন্তু ও কি, একেবারে কেঁদে ফেললেন যে! তবে শুনুন, একটা কান্নারই গান গাই—

চোখে যদি জল আসে
মুছো নাক তায়,
যেন কেঁদে কেঁদে বাহু বেঁধে
রাতি পোহায়।
সজল আঁখির আলো,
আমি বড় বাসি ভালো,
তাই আপনি বেদনা পেয়ে
তোমারে কাঁদাই।
ফুরালে মুখের কথা চেয়ে থেকো আঁখি পানে,
সজল বুকের ব্যথা আপনি বাজিবে প্রাণে,
যদি গো স্বপন আসে, লুটায়ে পড়িয়ো পাশে,

বিলোল বেণীর ফাঁসে
বাঁধিয়ো আমায় ॥

[ঐ বাড়ীর দোতলা। ডাঃ তালুকদারের লেবরেটরী। ডাঃ তালুকদার ও তাঁর অ্যাসিষ্টাণ্ট অন্নদাপ্রসাদ। তালুকদারের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ, চেহারা ভারীক্কে—অন্নদা বছর তিরিশের, চেহারা মোটার দিকে।]

ডাঃ তালুকদার। তাহলে ফলাফল বেশ ভালোই, কি বলো?

অন্নদা। বিলক্ষণ ভালো। ভারতীর মন থেকে নির্ম্মল, আর সঞ্জয়ের মন থেকে ছন্দা একদম মুছে গেছে—আর ওদের দু'জনের ভেতর দিব্যি ভালোবাসা জমে উঠেছে। অবস্থা এমন যে ওরা দু'বেলাই আমায় সাধ্য-সাধনা করছে, দেউড়ির বাইরে বের করে দিতে। নিজেরাও ফন্দী আঁটছে, কি করে পাঁচীরের ও-পিঠে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

তালুকদার। এই ত চাই। ছন্দার খবর কি?

অন্নদা। ছন্দা এখন সঞ্জয়কে হাড়ে হাড়ে ঘৃণা করছে। তার ধারণা, ওটা একটা ফচকে ছোঁড়া, ওতে আকর্ষণের কিচ্ছু নেই। ওর হাতে যে তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি, এজন্যে সে বেশ খুসীই হয়েছে। স্বামীর জন্যে মাঝে মাঝে খুব উতলা হতে দেখছি, তার সঙ্গে মিলতে পেলে ও যেন বর্ত্তে যায়, এম্নি ভাবও দেখাচ্ছে!

তালুকদাব। আর নির্ম্মলের?

অন্নদা। নির্ম্মলের এখনো বিকেলের দিকে একটু করে জ্বর হচ্ছে, তবে অবস্থা সারার মুখেই। সেও বুঝেছে তার ভুলই হয়েছে, সংশোধনের পথও খুঁজছে। স্ত্রীর খবর পাবার জন্যে একটু ব্যগ্রতাও দেখা দিয়েছে কাল থেকে।

তালুকদার। চমৎকার! তাহলে এই দু'জোড়া তরুণ-তরুণী ঠিক বুঝতে পেরেছে যে তারা নিতান্তই সাময়িক উত্তেজনায় একত্রে বাইরে পা দিয়েছিল—আসলে কেউ কারুকে ভালোবাসেনি। এবার তাহলে ওদের ঠিক পথ ধরিয়ে দেওয়া যাক। আচ্ছা ডাকো সঞ্জয়কে।

[ডাঃ তালুকদার বইয়ে মন দিলেন। একটু পরে অন্নদা এলো সঞ্জয়কে নিয়ে।]

অন্নদা। এই আমাদের কর্ত্তা।

তালুকদার। নমস্কার। এই যে বসুন। আপনি ক'দিন হল অতিথি হয়েছেন আমার—বড়ই আনন্দের বিষয়, কিন্তু এমনি ঝঞ্ঝাটে আছি যে একবার দেখা পর্য্যন্ত করতে পারি নি।

সঞ্জয়। নমস্কার। মহাশয়ের আতিথ্য সর্ব্বান্তঃকরণে উপভোগ করেছি, সে জন্যে কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি। এখন দয়া করে যদি বিদায় দেন এবং এই অসহনীয় আতিথ্যের জন্যে কি দিতে হবে জানান, তাহলেই কৃতার্থ হই।

তালুকদার। নিশ্চয়। আপনারা হলেন চলতি পথের পথিক—আপনাদের চিরদিন ধরে রাখবো, সে ক্ষমতা কি আমার আছে? আমার এই বাসাটিতে কত পাখীই এসে বসে—সময় হলেই উড়ে চলে যায়, আমি যে একা, সেই একা। থাকার মধ্যে আমার আছে এই সাইকোলজির বইগুলো, এদের ভেতর ডুব দিয়েই···

সঞ্জয়। সাইকোলজি? ওর চেয়ে মহাশয়ের প্রয়োজন বোধ করি ক্রিমিনলজিতেই বেশী হওয়াব কথা!

তালুকদার। দুটো পরস্পরের পরিপূরক। যাই হক, মহাশয়কে এবার বিদায় নিতে হবে—তার আগে একটি গৃহস্থের বধূকে নিয়ে স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ঝোঁকে অকূলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে কিছু দণ্ড নিয়ে যেতে হবে ত!

সঞ্জয়। এখনো কি কিছু বাকী আছে তার?

তালুকদার। সামান্যই। হ্যাঁ, চার্জ্জের কথা—ওটা আপনাকে দিতে

হবে না। কারুকেই দিতে হয় না এখানে, ওটা আমিই দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, শুনতে পেলাম, ভারতীর সঙ্গে নাকি আপনি আবার প্রেম করার চেষ্টা করেছেন! এক দিকে একটি গৃহস্থ বধূ, অন্য দিকে একটি কুমারী—শেষ পর্য্যন্ত কাকে চান আপনি?

সঞ্জয়। দেখুন, গৃহস্থ বধূ সম্বন্ধে কি করে যে ঐ ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল, তা আর ভাবতেই পারি না—সেজন্যে কোন নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করতেও তাই আজ আমার বাধে না। তবে ভারতীকে আমি চাই—আর এই চাওয়ার জন্যে যে-কোন মূল্য দিতেই আমি প্রস্তুত।

তালুকদার। কিন্তু ভারতীর পরে যে আবার উভয়-ভারতী দেখা দেবেন না, এমন কি লেখাপড়া আছে? আচ্ছা ডাকাচ্ছি তাকে।

[বেল টিপলেন—অন্নদা ভারতীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।]

ভারতী। আমায় ডেকেছেন?

তালুকদার। হ্যাঁ। তুমি এবার ইচ্ছা করলে নির্ম্মলের সঙ্গে চলে যেতে পারো। সে বেচারী তোমার আশায়···

ভারতী। না।

তালুকদার। কেন?

ভারতী। তাকে আমি আর চাই না। একদিন চেয়েছিলাম, কিন্তু এই ক'দিনে আস্তে আস্তে আমার চোখে তার সমস্ত রং ফিঁকে হয়ে গেছে—এখন বুঝতে পারছি, সে অতি তুচ্ছ, তাকে না পাওয়াই আমার পক্ষে শুভ হয়েছে।

তালুকদার। তাহলে তুমি কি চাও এখন?

ভারতী। দোহাই আপনার, আমাদের একত্রে বিদায় দিন—শপথ করছি···

তালুকদায়। আমাদের?

সঞ্জয়। আজ্ঞে, উনি বলছেন…

তালুকদার। থামুন। আপনাকে কি আমি জিজ্ঞাসা করেছি কিছু?

সঞ্জয়। করেন নি, তবে আস্তে আস্তে টের পেলাম, মহাশয় আমাদের অপমৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন, তারি আনন্দে…

তালুকদার। আচ্ছা, দিলাম দু'জনকেই মুক্তি। অন্নদা আপনাদের একেবারে সহরের সীমানায় রেখে আসবে—তার আগে ছন্দার স্বামীর জিনিষপত্র যা আপনি নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলি সে বুঝে নেবে!

ভারতী। আপনাকে আমাদের প্রণাম জানাই।

তালুকদার। আশীর্ব্বাদ করি, এবার তোমাদের জীবনে সত্যিকার মিলন দেখা দিক। দু'জনেই ভুল পথে অনেক দূর চলে এসেছিলে বলে, সেই পথের শেষেই ঠিক পথের নিশানাটা দেখতে পেলে। তোমাদের সেই পথে কিছুও যে সাহায্য করতে পারলাম, এই আমার আনন্দ!

সঞ্জয়। এতে আপনার লাভ?

তালুকদার। সেটা ভাববো কোন দিন হয়ত, কিন্তু এখন আপনারা যেতে পারেন। হ্যাঁ, এই খামটা নিয়ে যান, এর ভেতরেই হয়ত আপনাদের জিজ্ঞাসার মোটামুটি উত্তর পাবেন। আচ্ছা…

[দু'জনে নেমে গেল। অশ্বিনী ছন্দাকে ওপরে রেখে গেল।]

তালুকদার। এসো ছন্দা, তোমার স্বামীর সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে সেই বর্ব্বরটাকে হাতে পেলে আমি স্রেফ প্রাণদণ্ড দিতাম। ভেবে দেখলাম, সঞ্জয়ই তোমার যোগ্য সুহৃদ। তুমি স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে চলে যেতে পারো।

ছন্দা। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি টের পাবার আগেই যেন আমি আমার ঘরে গিয়ে বসতে পারি।

তালুকদার। স্বামী? সে ত একটা যাচ্ছেতাই লোক! তার সংস্রব

কাটিয়ে তুমি যে এতখানি সৎসাহস দেখাতে পেরেছো, এজন্যে তোমার আমি প্রশংসা না করে পারি না। আমাদের মেয়েরা শুধুই মেয়ে, মানুষ নয়। মানুষের মতো তারা

ছন্দা। আর লজ্জা দেবেন না আমায়। খুব শিক্ষা পেয়েছি। যে পথে পা দিয়েছিলাম, এখন বুঝতে পারছি, সে পথে আর দু'পা গেলেই ·

তালুকদার। তা তোমার স্বামী কোথায়?

ছন্দা। জানিনে ত তা। বাড়ীতেই আছেন, না কারুকে নিয়ে

তালুকদার। আচ্ছা, পাশের ঘরে যাও। মনে হচ্ছে, ওখানেই পাবে একটি লোককে, যে তোমার স্বামী হওয়া আশ্চর্য নয়।

ছন্দা। ভারী দয়ালু আপনি। আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছে করে আমার।

তালুকদার। পরিচয়? আমি মনস্তাত্ত্বিক—মন না জেনে, যারা সুযোগের টানে নয়ন নেশার ঘোরে বিপথে পা বাড়ায়, আর তার ফলেই ভালোবাসার মতো সুন্দর জিনিষ যাদের জীবনে হয়ে দাঁড়ায় প্রকাণ্ড একটা অভিশাপ, তাদের শুধরে দেওয়ার জন্যেই আমায় গড়তে হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। আর এই কাজে তোমরা যাকে নলিনী বলে জানো ছেলেরা জানে অশ্বিনী বলে, সেই অন্নদা হল আমার প্রধান সহকারী। আমরা দু'জনে নিজস্ব একটা পদ্ধতিতে এই সব ছেলে-মেয়ের চিকিৎসা করি—কি করে করি, তার কিছু কিছু আভাস তোমরা পেয়েছো আরো অনেকটাই পেতে, যদি না সে সময় তোমাদের চেতনা আচ্ছন্ন থাকতো। হ্যাঁ, একটা জিনিষ তোমাদের হয়ত রহস্যের মতো মনে হয়েছে—কি করে ছেলে-মেয়েদের আমি এখানে আনি। দেখো, এজন্যে সহরের অলিতে গলিতে আমায় রাখতে হয়েছে হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ আড়কাঠি, তারাই প্ররোচিত করে প্রেমে-পড়া ছেলে-মেয়েকে মেমনগরের পথে আসতে—তারপর কি হয়, সে ত আর বলে দিতে হবে না তোমাদের।

ছন্দা। আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তালুকদার। কল্যাণ হক। তোমার স্বামী তোমার মূল্য বুঝবেন আশা করি এরপর থেকে, আর তুমিও বুঝবে তাঁর মূল্য!

[অন্নদা এসে দাঁড়ালো]

অন্নদা। ওরা এসেছে। দু'জনকে দু'জায়গায় রেখে এলাম।

তালুকদার। আবার এক জোড়া। আচ্ছা, ব্যবস্থা করো।

ছন্দা। এর বুঝি আর বিরাম নেই?

তালুকদার। কি করে থাকবে? যৌবন মানেই ভুল করা, আর বয়স মানেই সে-ভুল শুধরে দেওয়া! আচ্ছা, তুমি এখন এসো। আমায় আবার তৈরি হতে হবে নতুন অতিথিদের জন্যে।

[নীচেয় ভাবতী গাইছে]

দিনের আলোয় ভুল ভেঙে যায়
রাতের বেলার।
শেষ হয়ে যায় ধুলো-খেলার!
আসা-যাওয়ার পথের মাঝে
তাই পেতেছো তোমার শিবির,
বাঁধন-হারা সব বিবাগী
জোটে হেথায় এই পৃথিবীর—
তুমি তাদের পথ খুঁজে দাও,
চলা যাদের হেলাফেলার॥


দু-নৌকায়

[বিকেল। রাস্তার দিককার একটি ঘর। গিরীন ঘোষ আর অলক মজুমদার মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে গল্প করছে। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো—পাশের এশ-ট্রেতে ধূমায়মান সিগার। সামে ঐ দিনের একখানা খবরের কাগজ।]

গিরীন। আসল কথা হচ্ছে টাকা। মেয়েরা ওটা ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝে না। মাধু যে ঐ ইঞ্জিনীয়ারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, তার কারণ ওর পুঁজির অঙ্কটা বেশ মোটা।

অলক। সত্যিই খুব মস্ত ধনী নাকি?

গিরীন। শুনি ত সেই রকম। তবে আমার ভেতর ভেতর বেশ একটু সন্দেহ আছে। তাছাড়া লোকটাকে কেন জানি না, আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।

অলক। তাহলে ওটাকে খেদিয়ে দিয়ে আমার দিকে আপনার ভগিনীর মনের মোড় ঘুরিয়ে দিন! দেখবেন, আমিও আপনার জন্যে যথাসাধ্য করেই তার প্রতিদান দোব।

গিরীন। ধন্যবাদ। আমি বিশেষ চেষ্টা করবো, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি।

অলক। আমার কি মনে হয় জানেন? আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই কবিটাকে হটাতে হলে, হেনা দেবীর কাছে তার অবিশ্বস্ততার একটা কোন জুতসই প্রমাণ হাজির করা দরকার। আপনার বোন ত অনায়াসেই তা করতে পারেন—তাঁর বন্ধু, আবার ক্লাস ফ্রেণ্ডও।

গিরীন। বন্ধু বটে, কিন্তু মেয়েদের মনের গতি ত বোঝেন! ভেতরে ভেতরে মাধু চায় না যে হেনা দেবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা ঘনীভূত হয়।

অলক। কেন?

গিরীন। কেন? মেয়েলী সঙ্কীর্ণতা, তাছাড়া আর কি বলবো?

অলক। আচ্ছা, সেই ভদ্রমহিলার এটিটিউড কি রকম?

গিরীন। বুঝি না। আমি তাঁর আশে পাশে ঘুরি, হৃদয়ের নাগাল পাই না কিছুতেই।

অলক। মাই গুডনেস! তা আপনার আবেদনটা তাঁর কাছে পৌঁছেছে কোন দিন?

গিরীন। নিশ্চয়! মাধুই ত বলেছে তাঁকে। কিন্তু ওদিক থেকে না হুঁ, না হাঁ। শুনেছি সেই কবিটার নাকি অগাধ টাকা, আর চেহারাও নাকি খুব সুন্দর।

অলক। ড্যাম ইট। প্রেমের পথে রূপ আর রূপেয়াটা বড় জিনিষ নয়, বড় জিনিষ হচ্ছে ট্যাক্ট।

গিরীন। তাই যে আমার নেই—তাইতেই ত এমন ভাবে-ভেঙে পড়েছি!

অলক। অবস্থা আমারো প্রায় তাই। দেখছেন না আপনার বোনের আচরণটা? তিনি সবই জানেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র কৃপাদৃষ্টি নেই তাঁর আমার ওপর। তিনি পাক খাচ্ছেন খালি সেই হাঁদা ইঞ্জিনীয়ারের প্রেমে।

গিরীন। ওর সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও ব্যাটার বাজারে কিছু খাতির আছে—সেটা এক্সপ্লয়েট করে নিচ্ছি। যাঁহা কাজ মিটবে, অমনি স্থান বিশেষে দুই লাথি দিয়ে সটান সদর রাস্তায় নামিয়ে দোব শ্রীমানকে।

অলক। বহু ধন্যবাদ। দেখবেন, আমিও যেমন করে পারি শ্রীমতী হেনা দেবীর সঙ্গে আপনার মিলন ঘটিয়ে দোবই।

গিরীন। শুনেছি আমার বোনের কাছে যে সেই কবিটা নাকি তাঁকে কলকাতার বাড়ী আর মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দিতে রাজী হয়েছে—আর বিয়েও নাকি এখনি করে ফেলতে চায়। সুতরাং দেরী করার সময় নেই!

অলক। কোন ভাবনা নেই। বাড়ী আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স যার থাকে, সে অত সহজেই তা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় না।

গিরীন। কিন্তু ব্যতিক্রমও ত হতে পারে!

অলক। বেশ ত, লীভ ইট টু মি। আমার দিকে একটু নেক-নজর করুন, দেখবেন, আমি সব ঠিক করে দোব। হ্যাঁ, যতটা বুঝছি, আপনার ভগিনী ইঞ্জিনীয়ারের প্রেমে একেবারে আঁকুপাঁকু করছেন—তাঁকে টেনে তোলা কিন্তু খুব সহজ হবে না!

গিরীন। আরে মশাই, মেয়েছেলের প্রেম ত! একদিন যার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, আর একদিন আপন হাতেই তার প্রাণ নিতে পারে! সেক্সপীয়ার কি বলেছেন, মনে নেই?

অলক। গুড হেভন্স! আপনার হেনা দেবীই যে আসছেন দেখি। বাস্তবিকই চমৎকার! ভাগ্যবান লোক আপনি।

গিরীন। মাধুও রয়েছে সঙ্গে, আপনারও হতাশ হবার কারণ নেই। কিন্তু ওরা বোধ হয় এই ঘরেই আড্ডা জমাবে। আসুন আমরা পাশের ঘরটায় গিয়ে বসি।

অলক। বেশ ত! দু-জনের কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে মনের অন্দরটাও হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে সেই সুযোগে!

[দুজনে দরজা ঠেলে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মাধুরী আর হেনা এলো ঘরের ভেতর। মাধুরীর রং শ্যামবর্ণ, টানা-টানা চোখ, কোঁকড়া চুল। হেনা ফর্সা—মাথায় তার এলো খোঁপা।]

মাধুরী। ভয় নেই, ছোড়দা বেরিয়ে গেছে।

হেনা। কি করে বুঝলি?

মাধুরী। শূন্য পেয়ালা আর জলন্ত চুরুটই তার প্রমাণ।

হেনা। চুরুট খেতে কেমন লাগে ভাই?

মাধুরী। দেখ না খেয়ে—ঝাল ঝাল, আর কেমন একটা বিটকেল গন্ধ!

হেনা। কেউ যদি দেখতে পায়?

মাধুরী। দুৎ!

[দু-জনে দু-টান দিয়ে থূ-থু করে ফেলে দিলে।]

হেনা। কি বিচ্ছিরি ভাই। ব্যাটা ছেলেগুলো কোন সুখেই যে খায় এই ছাই!

মাধুরী। ভগবান জানেন! কিন্তু ব্যাপার কি বল ত? ছ'টা ত বাজে।

হেনা! তাই ত! আমাকে বলেছিল, দুপুরে কোথায় একটা কাজ আছে—সেখান থেকে সাড়ে-পাঁচটায় সোজা এখানে এসে উঠবে।

মাধুরী। এরও ছুটি হয় পাঁচটায়। সাড়ে-পাঁচটায় এসে পড়বে কথা ছিল—বার বার করে বলে দিইছি।

হেনা। আচ্ছা লোক যাহক!

মাধুরী। আর বলিসনে। মেয়েদের এরা কি যে মনে করে!

হেনা। সত্যি ভাই, অথচ এদের না হলেও চলে না! একটা গান লিখেছি ওকে শোনাবো বলে—শুনবি তুই?

> কালকে এলে না তুমি জ্যোৎস্না রাতে,
> আমি থেকেছি ধন্না দিয়ে একলা ছাতে।
> পাশের বাড়ীতে কত গল্প-হাসি,
> কত আমোদ-প্রমোদ আর আলতো কাসি,
> শুধু আমার চোখের কোণে কান্না রাশি—
> তোমার যায় না আসে কিচ্ছু তাতে?

তুমি হয়ত তখন ছিলে আড্ডা জুড়ে,
কোন কাফেতে বারেতে নয় আস্তাকুঁড়ে—
আর তোমার স্বপন নিয়ে মরমে পুড়ে,
আমি লিখেছি ক্লাসের টাস্ক ক্ষিপ্র হাতে ॥

মাধুরী। ব্রিলিয়্যাণ্ট! একেবারে প্রাণের কথাটি!

হেনা। আসলে কি জানিস? ওরা মনে করে, আমরা খুব সস্তা, তাইতেই এত হেলাফেলা করে। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, তোদের সঙ্গে ইণ্ট্রোডিউস করিয়ে দোব—তারপর চার জনে দিবিা একটা সিনেমায় গিয়ে বসা যাবে। কেমন চমৎকার হত, বল ত! অমন স্বন্দর প্ল্যানটা স্রেফ মাটি করে দিলে।

মাধুরী। আমি ত সেই জন্যেই তোকে বলেছিলাম, ও-সব হ্যাঙ্গাম করিসনে।

হেনা। কি করে বুঝবো বল? আজই সকালে কথা হয়েছে যে।

মাধুরী। সকালে এসেছিল বুঝি?

হেনা। আসেনি আবার? কি ছাইয়ের গাড়ী কিনবে, আমায় গিয়ে তাই পছন্দ করে দিতে হবে। কি ফ্যাসাদ দেখ দিকি!

মাধুরী। গাড়ী কিনবে? তোর কপালটা ভাই বেশ!

হেনা। তুইও বল না একটা কিনতে।

মাধুরী। বলেছি ত। বলে, বিয়ের পর প্রেজেণ্ট করবে।

হেনা। কি গাড়ী কিনবি?

মাধুরী। কি কেনা যায় বল ত? ইলার গাড়ীটা দেখেছিস? বেশ, না?

হেনা। কম দামী। আমারটা দেখিস, একটা জিনিষের মতো জিনিষ।

মাধুরী। কেনা হয়ে গেছে তোর?

হেনা। এখনো হয় নি। বায়না দিয়ে রাখতে বলেছি। বাড়ীটা আগে ঠিক না হলে, গাড়ী থাকবে কোথায়?

মাধুরী। বাড়ীও কিনছে বুঝি?

হেনা। কিনবে কেন? প্রকাণ্ড বাড়ী ত আছেই সেণ্ট্রাল এভেন্যুতে, আমি গিয়ে দেখে এসেছি। ভাড়াটে আছে, উঠে যেতে নোটিশ দিয়েছে তাদের।

মাধুরী। তাহলে আর কি! বাড়ী, গাড়ী, জমিদারী—তুই ত মেরে দিলি কিস্তি!

হেনা। তোরই বা দুঃখু কি? টাকার ত গতি-গঙ্গা নেই—তার ওপর বিলাত যাচ্ছিস, দিব্যি অক্সফোর্ডে পড়বি, প্যারিসে বেড়াবি, ফ্লোরেন্সে প্লেজার-ট্রিপ দিবি!

মাধুরী। কি জানিস? আমার শ্বশুরেরও অবস্থা ভালো, কিন্তু এরা যে অনেকগুলো ভাই কিনা! তুই বেশ এক ছেলের বৌ, কোন বালাই নেই—এমন কি শ্বশুর-শাশুড়ী পর্য্যন্ত নেই!

হেনা। যা ভাই, বৌ কথাটা শুনলেই কেমন যেন লজ্জা করে!

মাধুরী। ইস, তোর আবার লজ্জা! চিরদিনই ত দেখেছি, তুই এসব ব্যাপারে ভীষণ ষ্ট্রেট-ফরোয়ার্ড!

হেনা। লজ্জা নইলে মেয়েমানুষের রূপই খোলে না। যেদিন থেকে মনে ভালোবাসার জন্ম হয়, সেদিন থেকেই দেখা দেয় লজ্জা, আর তখনি মেয়েমানুষ হয় মহিলা—বুঝেছিস!

মাধুরী। কে জানে ভাই, ভালোবাসা টাসা বুঝি না অত! বিয়ে করতে হয় করবো—দ্যাটস অল!

হেনা। আহা মরে যাইরে! তাহলে বাপ-মায়ের হাতে ছেড়ে না দিয়ে, বর বেছে নেবার দায়টা নিজে নিইছিস কেন?

মাধুরী। বাপ-মায়ের ধরে-দেওয়া বরকে বিয়ে করতে হলে আরো দশ

বছর আগে করা উচিত ছিল, যখন চোখ ফোটে নি। তোরই হক, আর আমারই হক, বাপ-মায়ের যা অবস্থা, তাতে আধমরা একটা স্কুল মাষ্টার, নয়ত মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণি ছাড়া আর কি জুটতো আমাদের বরাতে? এই যে তুই একটা লক্ষপতি বাগিয়েছিস, এ তুই ও ভাবে পেতিস?

হেনা। আর তুই?

মাধুরী। আমার অবশ্য তোর হিসাবে এমন কিছু নয়, তবু মন্দের ভালো বৈকি! দেখ হেনী, ল্যভই বল, আর যাই বল, আসল জিনিষ ত টাকা—তাছাড়া কোন কিছুরই কোন দাম নেই!

হেনা। তা আর বলতে? নইলে কিছু মনে করিস না—আমিই বা তোর ছোড়দাকে বাতিল করলাম কেন, তুই-ই বা সেই অলক রায়টাকে অমন পায়ে থেঁৎলালি কেন? এরা ত আমাদের ভালো কম বাসে নি। আমার ভাই বড্ড দুঃখ হয় বেচারীদের জন্যে!

মাধুরী। হয় আমারো, কিন্তু উপায় নেই। শুধু ভালোবাসার জন্যে পান্সী ভাসাবার বয়স নেই আর!

হেনা। সত্যি, বেচারীরা। কিন্তু ব্যাপার কি বল ত? এদিকে যে অন্ধকার হতে চললো!

মাধুরী। তাই ত! আসল কথাটাই ভুলে বসে আছি! আসবে না নাকি? আচ্ছা, করছি এর ব্যবস্থা—ইরেগুলার, আনপাঙ্কুয়াল, ডিজ-অনেষ্ট!

হেনা। স্কাউণ্ড্রেল, ভাইপার, সুইণ্ডলার!

[দু-জনেই হো হো করে হেসে উঠলো। ইতিমধ্যে একটি যুবক এসে দাঁড়ালো দু'জনের মধ্যে। তার গায়ে বুক-কাটা কোট, গলায় নেকটাই—আর পরণে কাবুলি কোঁচ দিয়ে পরা ধুতি, পায়ে ঘুন্টিদার নাগরা।]

হেনা। হ্যালো ডার্লিং, তোমার একটু সময়ের জ্ঞান নেই। এ কি? এ কি অদ্ভুত পোষাক? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

মাধুরী। ওয়েল! তুমি হেনাকে চেনো, আর আমায় বলো' নি, আচ্ছা দুষ্টু ত! এসো, এখানে এসো।

হেনা। তার মানে?

মাধুরী। তার মানে হি ইজ মাই ম্যান।

হেনা। সে কি? হি ইজ মাইন!

মাধুরী। চালাকি করিসনে হেনী!

[দু-জনে দুটো হাত ধরলো তার]

হেনা। কি, কথা কইছো না যে? কে তুমি—মৃগাঙ্ক মল্লিক, না অনুপম মজুমদার? হেনা দেবীর ল্যভার, না মাধুরী দেবীর?

যুবক। আমি দুইই এবং দু-জনেরই!

হেনা ও মাধুরী। অ্যাঁ, অ্যাঁ?

যুবক। হ্যাঁ গো সত্যি, বিগ্নে ছুঁয়ে বলছি!

হেনা। জোচ্চোর, শয়তান।

মাধুরী। অসভ্য, ইতর, ছোটলোক!

যুবক। বলো কি? এই ও-বেলা পর্য্যন্ত ছিলাম দু-জনেরই প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, হৃদয়-বল্লভ, এণ্ড হোয়াট নট! বাড়ী চাই, গাড়ী চাই, হীরের গয়না চাই, বিলেত যাওয়া চাই! আমার জন্যে জীবন, যৌবন, দেহ, মন, সব উজাড় করে দেবার জন্যে ছটফট করে মরছিলে! এরি মধ্যে সব উল্টে গেল?

মাধুরী। যাও, ভাগো এখান থেকে!

হেনা। বেরোও শীগ্রী, নইলে পুলিশ ডাকবো আমরা।

যুবক। বহুৎ আচ্ছা! আমার খেলা শেষ হয়েছে, এবার চললাম। তা তোমাদের এতেই আক্কেল হবে ত?

[গুণ গুণ করে একটা গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল। মাধুরী আর হেনা খানিকটা হতভম্ব হয়ে রইলো, তারপর দু'জনে দু'জনের গলা

জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে। হঠাৎ মাঝের দরজা খুলে ঢুকলো অলক আর গিরীন—দু-জনের হাতে দুটি সিগারেট।]

দু-জনে। মা ভৈষী !

মাধুরী। ওমা ছোড়দা যে !

গিরীন। এঁকে কোন দিন দেখেছিস বলে মনে পড়ছে ?

মাধুরী। হ্যাঁ, নমস্কার।

অলক। নমস্কার !

গিরীন। দেখ মাধু, অলক বাবু বোধ হয় কি একটা কথা বলতে চাইছেন তোকে।

মাধুরী। সে জন্যে তোমাকে ওকালতী করতে হবে না—কথাটা উনি আগেই বলেছেন, উত্তরটাও এখুনি পাবেন। তুমি বরং হেনা কি বলছে, সেই কথাটাই মন দিয়ে শোনো।

হেনা। মাধু আমি ভাই চললাম।

মাধুরী। ইস, লজ্জায় একেবারে মরে গেলি যে !

অলক। আর ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি অভাগাদের ? দু-জনেই এক-একটা সাফ জবাব দিয়ে দিন যে আমরা হয় মরে বাঁচি, নয় বেঁচে মরি !

মাধুরী। এখনো কি পান নি সেটা ?

অলক। পেয়েছি বোধহয়।

গিরীন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়েছি বলেই ত মনে হচ্ছে। ভাগ্যিস ঠিক জায়গাটিতে ছিলাম, নইলে কি আর এত সহজে খতম হত এই মামলা ?



[মঞ্জুর পড়ার ঘর। এক কোণে টেবিলের ওপর সারি দিয়ে সাজানো অনেকগুলি বই—তার কোলে গোছা করে রাখা এক গাদা খাতা। এক ধারে দোয়াতদানি, অন্যধারে চিনেমাটির ফুলদানিতে কয়েকটা কাগজের ফুল। টেবিলে ঝুঁকে বসে মঞ্জু একখানা খাতার খোলা পাতার ওপর তাকিয়ে রয়েছে, হাতের কাছে চায়ের পেয়ালাটা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে। মঞ্জুর বয়স ষোল—একহারা সুশ্রী চেহারা, গায়ে হাল্কা বাদামী রঙের একটি স্কার্ফ, পায়ে একজোড়া, সবুজ চটি। চাকর অযোধ্যা ঘরের মেঝেয় ঝাঁট দিচ্ছে।]

মঞ্জু। হ্যাঁ রে অযোধ্যা, আমি ওপরে গেলে এ ঘরে কেউ ঢুকেছিল ?

অযোধ্যা। না ত দিদিমণি, কেন কিছু হারিয়েছে নাকি ?

মঞ্জু। না। আমার খাতায এই অঙ্কটা করে রেখে গেল কে ?

অযোধ্যা। অঙ্ক ?

মঞ্জু। হাঁ্যা রে, বেলা বারোটা পর্য্যন্ত ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও মেলাতে পারি নি, শেষটা বিরক্ত হয়ে গেছি শুতে—সেই অঙ্ক পরিষ্কার ঝরঝরে হাতে করে রেখে গেল কে ?

অযোধ্যা। তা ত আমি বলতে পারি নে দিদিমণি। কৈ কেউ ত আসে নি এ ঘরে আজকে ! আসবেই বা কে ?

মঞ্জু। সত্যিই ত। অন্যদিন না হয় বিমলদা আসে, আমি এদিক সেদিক গেলেই সর্দ্দারী করে এটা-সেটা খাতায় লিখে রাখে—সে ত এক হপ্তার ওপর এখানে নেই। জামাইবাবুও ত এ বাড়ী আসেন নি অনেকদিল হল—তাহলে ?

অযোধ্যা। তাই ত দিদিমণি, তা ল্যাখাটা কি চেনা মনে হচ্ছে তোমার ?

মঞ্জু। না রে, ভারী মজা ত !

অযোধ্যা। আচ্ছা দিদিমণি, আমায় একটু ল্যাখাপড়া শেখাও না আপনি। বেশী নয়, এই একটু ইঙ্গিরী টিঙ্গিরী, আর একটু আঁক টাঁক !

মঞ্জু। বাংলা জানিস তুই ?

অযোধ্যা। উঁ-হুঁ। কোথেকে জানবো দিদি ? গয়লার ছেলে, জানি শুধু গোরু চরাতে।

মঞ্জু। বাংলাই জানিস নে, তার ইংরেজী পড়বি ? আগে ছোড়দিদিমণির কাছে অ-আ শিখে নিগে, তারপর দেখা যাবে অখন। ঐ শোন, মা ডাকছেন।

অযোধ্যা। যাই মা। [প্রস্থান]

[বিনোদবাবুর প্রবেশ। মাথায় অল্প টাক, গায়ে গলাবন্ধ কোট, পায়ে ভট্টাচার্যি চটি। পাইপ খেতে খেতে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন।]

বিনোদ। হ্যাঁ রে, নরেন রায় বলে কার নামে এই চিঠিখানা এল আমাদের ঠিকানায় ?

মঞ্জু। নরেন রায় ? সে আবার কে ? কোথেকে আসছে চিঠিখানা ?

বিনোদ। কুঁকড়োদা পোষ্টাফিস, নদীয়া জেলা।

মঞ্জু। ঠিকানা ভুল করে এসেছে বোধ হয়। এই নামের কেউ এখানে থাকে না লিখে, ডাকে ফেরৎ দিলে হয় না ?

বিনোদ। তাই দে। কিন্তু সরাসরি আমার কেয়ারে আসছে, ভুল বলে ত মনে হয় না ! আচ্ছা, ত্থাখ তুই চিঠিখানা। [প্রস্থান]

মঞ্জু। এ সব কি কাণ্ড ? ভাড়াটে বাড়ী নয়, মেস নয়, আমাদের ঠিকানায় বাবার কেয়ারে কে এক নরেন রায়ের নামে চিঠি আসছে, জন-মনিষ্যির দেখা নেই, আমার খাতায় ঝরঝরে সুন্দর হাতে কে অঙ্ক করে রাখছে—এ দুটোর ভেতর কোন সম্বন্ধ নেই ত !

[মঞ্জুর ছোট বোন স্নেহ দৌড়ুতে দৌড়ুতে ঘরে এসে ঢুকলো। স্নেহর বয়স এগারো, থাক করে কাটা চুল, গায়ে রঙীণ ফ্রক, তার ওপরে গরম পুল-ওভার, পায়ে মাদ্রাজী স্যাণ্ডাল।]

স্নেহ। দিদি, মা ডাকচে, খাবি চল। উঃ কত পড়ছিস দুপুর থেকে !

মঞ্জু। হ্যাঁ, খুব পড়ছি! যা যাচ্ছি, পোয়েট্রিটা করে তার পর ইংরেজী উঠবো। তুই বরং একবার অযোধ্যাকে পাঠিয়ে দিগে।

স্নেহ। আজ সেই গল্পটা বলবি ত রাত্রিবেলা?

মঞ্জু। বলবো। এখন ত নয়।

[কবিতার বইটা খুলবামাত্র মঞ্জুর হাতে পড়লো একখানা কাগজ, যা দেখেই সে চমকে উঠলো। কিন্তু জিনিষটা সে স্নেহর সাম্নে গোপন করে গেল।]

স্নেহ। জানিস দিদি, আশুকাকা কাল মাকে কি লিখেছেন?

মঞ্জু। কি?

স্নেহ। নদীয়া জেলার সেই কোন জমিদার বাড়ীর ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা হচ্ছিল না, সে নাকি ভাই বিয়ের নাম শুনেই বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে!

মঞ্জু। তাতে আমার বয়ে গেল। সে চুলোয় যাক না!

স্নেহ। তা ত বটেই, তোর ত ইচ্ছে বিমলদার সঙ্গে···

মঞ্জু। ভালো হচ্ছে না কিন্তু স্নেহ।

স্নেহ। ইস, আমি বুঝি আর কিচ্ছু জানি নে? সেদিন বিমলদা তোকে যে চিঠি দিয়েছে, তাতে কি লিখেছে?

মঞ্জু। কি লিখেছে?

স্নেহ। তোমাকে আমি খ—ব—ভা—লো—বা—

মঞ্জু। থাম মুখপুড়ী। দাঁড়াও, এক্ষুনি মাকে বলে দিচ্ছি। ভেতরে ভেতরে তুমি পেকে উঠেছো, না?

স্নেহ। বা রে! বিমলদা তোর পায়ে ধরে নি একদিন? আর একদিন তোর মুখে চু···

মঞ্জু। অমন করলে কিন্তু আমিও আয়না ভাঙার কথা বলে দোব মাকে।

স্নেহ। না ভাই, বলিস নে। আচ্ছা, আর কিচ্ছুটি বলবো না—এই পালাচ্ছি। [প্রস্থান]

[অযোধ্যা এক প্লেট খাবার এবং এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকলো।]

অযোধ্যা। দিদিমণি, মা বললেন, আজ সকাল-সকাল পড়া সেরে নিতে— তাঁকে রান্নার যোগান দিতে হবে।

মঞ্জু। আচ্ছা। ওরে দেখ, এই চিঠিখানা রাস্তার ডাকবাক্সে দিয়ে আয় ত। ডাকবাক্স চিনিস ত ?

অযোধ্যা। তা আর চিনিনে দিদিমণি ? আমাদের গাঁয়েও যে আছে— জমিদার বাড়ীর গায়েই একটা ঝোলানো থাকে, অধর পিয়ন তা থেকে চিঠি নিয়ে যায়।

মঞ্জু। আচ্ছা যা।

অযোধ্যা এ যে ছাপ-মারা চিঠি দিদিমণি, এ আবার ডাকে দোব কি ?

মঞ্জু। কার চিঠি কে জানে, ভুল করে আমাদের ঠিকানায় এসে পড়েছে। ডাকে ফেলে দিগে, পোষ্টাফিস খুঁজে দেখবে।

অযোধ্যা। আচ্ছা দিদিমণি, একটা চাকরি হয় না আমার কর্ত্তা বাবুর অফিসে ? এই ছোট মোট একটা কোন চাকরি, পনেরো-কুড়ি টাকার মতো।

মঞ্জু। বলিস কি ? অ-আ পর্য্যন্ত চিনিস না, পনেরো-কুড়ি টাকা দিয়ে তোকে রাখবে কে ?

অযোধ্যা। আপনি একটু কর্ত্তা বাবুকে বলে দাও না দিদিমণি, তাহলে নিশ্চয় হবে। এখানে মোটে পাঁচ টাকা মাইনে, তাও ত ঠিকে কাজ, বনমালী এলেই মেয়াদ ফুরুবে। তখন কি খেয়ে বাঁচবো দিদি ? গাঁয়ে ঘরে ভাত নেই, তাতেই না পেটের দায়ে কলকাতায় আসা ! রায় বাবুদের এত করে ধরলাম, ধানখালির রায়রা—আমাদেব গাঁয়ের জমিদার বাবুরা, তা ফিরেও তাকালে না। বড়লোক দিদি, ওরা কি আর গরীবের দুঃখু বোঝে ?

মঞ্জু। বলে কি ? ধানখালির রায়রা, আশুকাকার সেই মক্কেলরা না ?

তাহলে ত এর কাছ থেকে অনেক খবর বের করা যাবে তাদের! আচ্ছা, বনমালী এখানে সাত টাকা মাইনে পেত না?

অযোধ্যা। সে যে পুরনো লোক কি না। কর্ত্তা বাবু বললেন, তুমি আনাড়ী লোক, কাজকর্ম্ম কিছু জানো না, নেহাৎ না হলে চলে না তাইতেই রাখছি তোমাকে—এই বলে দু-টাকা কমিয়ে দিলেন।

মঞ্জু। আচ্ছা, আমি বলবো অখন বাবাকে, তোকে আর দু-টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে।

অযোধ্যা। তাহলে বড্ড উপকার হয় দিদিমণি। [প্রস্থান]

মঞ্জু। দেখি সেই কাগজখানা এবার। কি সর্ব্বনাশ, এ ত দেখছি আমাকেই লেখা চিঠি! পড়ি ত—'মঞ্জুবাণী, তুমি নিশ্চয় ভয় পাচ্ছো—ভয় নেই, আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না, তোমার মাষ্টার মশাই সেরে না ওঠা পর্য্যন্ত আমি তোমার টাস্কগুলো করে দোব শুধু। আমি কে জানো? আমি সরকারদের তারক, যাকে অকারণ পায়ে ঠেলে গত-জন্মে তুমি এস, এন, সেনকে মালা দিয়েছিলে! মরে তোমায় ভুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম কৈ? ভূত হয়েও তোমার পায়ে পায়ে ঘুরছি। এ জন্মে তুমি হয়েছো বিনোদ মল্লিকের মেয়ে, আর সেই এস, এন, সেনই এসেছে বিমল হয়ে—কিন্তু ভয় নেই, অভাগা তারক তোমার পথের কাঁটা হবে না। ইতি—

তোমারি উপেক্ষিত।'

[মঞ্জু দু-হাতে বুক চেপে ধরলো। ভয়ে সমস্ত শরীরে তার কাঁটা দিয়ে উঠলো, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো, আর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো থর থর করে।]

সর্ব্বনাশ তাহলে ত দেখছি সত্যিই আমার পেছনে ভূত লেগেছে, আর সে ভূতের নাম তারক! কিন্তু আমার ত কিছুই মনে পড়ে না—কবে, কোন জন্মে করেছি তাকে অনাদর, আর সেই ভালোবাসার কাঁটা বুকে নিয়ে জন্ম

জন্ম সে ফিরছে আমারি পিছু পিছু! কি করি এখন? আচ্ছা, আমিও চিঠি লিখে রাখি তাকে, লিখে রাখি যে পূর্ব্ব জন্মের কথা আমার মনে নেই—তবু, তবু আমায় তুমি ক্ষমা করো তারক। আর বিমল? বিমলকে আমি চাই নে, কারুকেই আমি চাই নে—আমি একলা থাকবো, সম্পূর্ণ একলা। পূর্ব্ব-জন্মে তোমায় দিয়েছি যে দাগা, এ জন্মে নিজেকে সব দিক থেকে বঞ্চিত করে করবো তারি প্রায়শ্চিত্ত!

[দোয়াত-কলম নিয়ে খস খস করে সে লিখে ফেললো একখানা চিঠি, তারপর কাগজখানার ওপর পেপার-ওয়েট চাপিয়ে, সেখানা খাতাগুলোর আড়ালে রাখলো এবং এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।]

[সন্ধ্যার একটু পরে। পড়ার ঘরে সবুজ শেড ঘেরা টেবিল ল্যাম্পটি জ্বলছে। আগে আগে এসে ঢুকলো বিমল, তার পিছু পিছু স্নেহ। বিমলের মাথায় হাল্কা টেড়ী, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে শুঁড়-তোলা নাগরা।]

স্নেহ। কোথায় ছিলেন এতদিন, সত্যি বলুন না?

বিমল। চুপ, চুপ!

স্নেহ। কেন, অমন করছেন কেন বিমলদা?

বিমল। আছে, আছে, একটা ব্যাপার আছে। কারুকে কিচ্ছু না বলে, তুমি শুধু তোমার দিদিকে একবার নীচেয় পাঠিয়ে দাও গে—বুঝেছো!

স্নেহ। বুঝেছি, আমি বুঝি এতই বোকা!

বিমল। কি বুঝেছো বলো ত?

স্নেহ। দিদি রাগ করেছে—তাই, না?

বিমল। হ্যাঁ, তাই।

স্নেহ। আমাকে কি দিচ্ছেন, দিন আগে, নইলে কিন্তু বলতে পারবো না কিচ্ছু।

বিমল। সে আর বলতে হবে না তোমাকে। এই নাও, তোমার এক বাক্স চকোলেট। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা শুনবে ত?

স্নেহ। আচ্ছা যাচ্ছি। দিদি বোধ হয় বাথরুমে—ঐ শুনছেন না, চিঁ-চিঁ করে গান? দিদি কলে ঢুকলেই তার গান পায়!

[প্রস্থান]

[বিমল ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগলো। তারপর চেয়ারে বসে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে বই-খাতা ওল্টাতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গেই হাতে পড়লো তার তারককে লেখা মঞ্জুর চিঠিটা। এক নিঃশ্বাসে সেটা পড়ে ফেলে, সে মুখে একবার 'হুম' শব্দ করলো। মঞ্জু আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো তার পেছনে—মঞ্জুর পরণে জামরঙা শাড়ী, গায়ে হাতাহীন ব্লাউজ, গলায় গোলাপী মাফলার।]

মঞ্জু। কি বিমলদা, চুপি চুপি কখন এসেছো? অযোধ্যা, এই চা দিয়ে যা রে বাইরে।

বিমল। নিঃশব্দে না এলে কি আর তোমার ফিকিরটা এত তাড়াতাড়ি ধরতে পারতাম?

মঞ্জু। তার মানে?

বিমল। তার মানে শুনবে? তুমি একটি আস্ত ব্যবসাদার মেয়ে! দিনের পর দিন আমাকে বৃথা আশায় নাচাচ্ছো, আবার আমার আড়ালে কে এক ব্যাটা তারকের সঙ্গে করছো চিঠি চালাচালি—তাকে বলছো, বিমলকে তুমি চাও না। কেন, বিমলকে কি তুমি পথের কুকুর মনে করো নাকি?

মঞ্জু। এ সব তুমি কি বলছো বিমলদা?

[ইতিমধ্যে অযোধ্যা একটা ট্রে-তে খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হল। বিমল আঙুল উঁচিয়ে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করতেই, সে 'ওরে বাবা' বলে দিলে এক দৌড়।]

বিমল। কি বলছি তা জানো না? এটা কি? হাতে-নাতে ধরা পড়েছো, তারপরও ন্যাকামি? ভেবেছিলে আমি কিছুই টের পাবো না, না? ঈশ্বরই ধরিয়ে দিয়েছে, নইলে ত দেখছি আমার কপালে কষ্ট ছিল!

মঞ্জু। আসল ব্যাপার তুমি কিচ্ছুই বোঝো নি।

বিমল। খুব বুঝেছি, বুঝতে আর কি বাকী আছে কিছু? ভেতরে ভেতরে লোক জুটিয়ে তার সঙ্গে ফূর্ত্তি চালাচ্ছো, আর বাইরে বিড়াল তপস্বীটি সেজে···

মঞ্জু। মোটেই না। আমি নিজেই বুঝিনি ব্যাপারটা ভালো করে।

বিমল। আহা রে, নেকুমণি আমার!

মঞ্জু। দেখো বিমলদা, যা খুসী তাই বলছো তুমি, আমি কিন্তু কিছুই বলি নি এখনো। এবার আমিও সোজা জবাব দোব—আমার যা ইচ্ছা তাই করছি আমি, তোমার কি তাতে? তুমি কিসের জন্যে আমার ওপর চোখ রাঙাতে এসেছো? তোমার আমি ধার ধারি না, যাও!

বিমল। তোমার মতো কোকেটকে আমিও থোড়াই কেয়ার করি—আমি এখনি চলে যাবো, কিন্তু যাবার আগে তোমার বিদ্যেটা সকলকে জানিয়ে দিয়ে যাওয়া দরকার, নইলে···

মঞ্জু। খবর্দ্দার, আমার কাগজপত্র তুমি কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারবে না। তাহলে কিন্তু এখনি আমি চোর চোর করে চেঁচিয়ে লোক জড় করবো। ভালো চাও ত ভদ্রলোকের মতো বেরিয়ে যাও, আর কোন দিন আমার সাম্নে এসো না।

বিমল। বটে? আচ্ছা, কিন্তু মনে থাকে যেন!

[মঞ্জু টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।]

মঞ্জু। না, না, এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। কোথা থেকে এক প্রেতাত্মা এসে লাগলো আমার পেছনে—আমার জীবনে বাধালো এই গণ্ডগোল!

তাকে দেখতে পাচ্ছি না, জানতে পারছি না, কিন্তু সর্ব্বদাই বুঝতে পারছি, সে রয়েছে আমার ওপর ওঁৎ পেতে। কি করি, কোথায় যাই? না, না, আমি ভয় করবো না—আমিও আজ ওঁৎ পেতে থাকবো, দেখবো সেই ভূতকে—সত্যিই সে দেহ ধরে আসে, না ছায়ার মতো এসে করে যায় আমার অঙ্ক, লিখে যায় আমাকে চিঠি! দেখবো তাকে, দেখবো আর বলবো, আমায় তুমি ছেড়ে যাও, আমায় তুমি শান্তি দাও!

[রাত্রি বারোটা, চারদিক অন্ধকার। বাড়ীর সবাই ঘুমিয়েছে, শুধু মঞ্জু নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে পড়ার ঘরের সাম্নে।]

মঞ্জু। সর্ব্বনাশ! সত্যিই ত ঘরে আলো জ্বলছে, তাহলে ত সে এসেছে! দেখি জানলার ফাঁক দিয়ে—হ্যাঁ, তাই ত! ঐ ত কে টেবিলে ঝুঁকে বসে এক মনে কি লিখছে! অযোধ্যা কৈ? তার বিছানার একটা কোণা দেখা যাচ্ছে, র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সে বোধ হয় ঘুমুচ্ছে ঐ দিকটায়, সে বোধ হয় জানতেই পারছে না কিছু! কি করি এখন? দুয়োরটা খুলতে পারলে হত!

[একটু ঠেলতেই ভেজানো দুয়োর খুলে গেল। মঞ্জু নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেই দেখলো, আর কেউ না, স্বয়ং অযোধ্যা বসে বসে অ্যালজ্যাবরা কষছে। পা টিপে টিপে তার পেছনে এসে দাঁড়ালো মঞ্জু।]

অযোধ্যা। আচ্ছা বেয়াড়া অঙ্ক যা হক।

মঞ্জু। অযোধ্যা, কি হচ্ছে ওটা?

অযোধ্যা। [চমকে উঠে] কিছু না দিদিমণি!

মঞ্জু। দেখি কি। তাই বলি—তুমি, তুমিই তলায় তলায় এত কাণ্ড করছো? বদমায়েস, কে তুমি?

অযোধ্যা। কারুকে বলবেন না বলুন!

মঞ্জু। না!

অযোধ্যা। আমার নাম নরেন—ধানখালির জমিদার···

মঞ্জু। ধানখালির জমিদারের ছেলে? তুমিই বিয়ের নামে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলে? ও-বেলার চিঠিখানা···

অযোধ্যা। আমারি। আমার মা লিখেছেন।

মঞ্জু। তা তোমার এই ফন্দী কি জন্যে?

অযোধ্যা। বলছি। তোমাব বাবার কি রকম ভাই হন আশুবাবু, আমার মাকে তিনি অস্থির করে তুলেছিলেন—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়া নিয়ে। এড়াতে না পেরে মা শেষটা কথা দিয়ে ফেললেন, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা, আমি যাকে বিয়ে করবো, আগে তার সঙ্গে মেলামেশা করবো, তাকে বেশ করে যাচিয়ে বাজিয়ে দেখবো, তারপর মনের মতো বুঝলে তবেই বিয়ে করবো। কাজেই বাড়ী ছেড়ে বেরুলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে ভাব করি কি করে? ভদ্রলোক হয়ে এলে ত বাংলা দেশে বয়স্থা মেয়ের সঙ্গে আলাপ করার কোন সুযোগ নেই—তাই ভেবে-চিন্তে অবশেষে চাকর সাজলাম, আর বনমালীকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ঘুষ দিয়ে, তাকে কিছুদিনের মতো ছুটি নিইয়ে তার জায়গায় এসে ঢুকলাম, তারি সুপারিশে। তারপর দেখলাম, ব্যাপাব সুবিধে নয়, তুমি বিমলের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছো, তখন তাকে তাড়াবার ফন্দী আঁটলাম—সে ফন্দীও কাজে লেগে গেল! ভাবছিলাম, পরীক্ষা শেষ হয়েছে, এবার টুক করে একদিন সরে পড়বো, কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম তোমার গোয়েন্দাগিরির দাপটে!

মঞ্জু। কি হল তোমার পরীক্ষার ফল?

অযোধ্যা। নাইবা শুনলে সে কথা! মনে করো না, অন্য অনেক চাকরের মতো অযোধ্যা বলেও একটা চাকর এসেছিল তোমাদের বাড়ীতে—সে ছিল ভদ্রলোকের ছেলে, আর লেখাপড়া জানতো, তাই তোমার প্রাইভেট মাষ্টার অসুখে পড়ায় তাঁর হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার খাতায় অঙ্ক করে

রাখতো, আর দুষ্টুমি করে ভূত সেজে তোমাকে ভয় দেখাতো—তারপর আস্তে আস্তে ভুলে যেও তাকে, যেমন আর সকলকেই ভুলেছো!

মঞ্জু। না, সে আমি পারবো না। আমি তোমাকে যেতে দোব না আর এখান থেকে।

অযোধ্যা। তাহলে কি চিরদিনই আমি এমনি ধারা চাকর হয়ে থাকবো তোমাদের বাড়ীতে?

মঞ্জু। বা রে, তা কেন? তোমার ত··· না, না, তুমি যেতে পাবে না, কিছুতেই না। তাহলে আমি বিষ খাবো। আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি, তাইতেই চলে যাচ্ছো! আচ্ছা যাও, দেখো এর পরে আমি কি করি!

অযোধ্যা। মঞ্জু, মঞ্জুরাণী!

[তাকে জড়িয়ে ধরলো। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে খোলা দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন বিনোদ বাবু ও তাঁর স্ত্রী।]

গিন্নী। মঞ্জি, পোড়ারমুখী, গলায় দড়ি জোটে না তোর? আর্দ্ধেক রাত্রে উঠে এসে চাকরের সঙ্গে··· ছি, ছি, কি ঘেন্না! তাই বলি, বিমলকে শুধু শুধু অপমান করে তাড়াবে কেন? অমন সোনার চাঁদ ছেলে বিমল, তাকে ফেলে কিনা শেষটা ছোটলোকে মতি হল! বেরো, বেরো হতচ্ছাড়া মেয়ে, আমার বাড়ী থেকে!

বিনোদ। হ্যাঁ রে ব্যাটা অকাল-কুষ্মাণ্ড, মরণের ভয় নেই তোর? বাঁদর হয়ে এসেছিস চাঁদে হাত দিতে! বেরো ব্যাটা নচ্ছার, আমার বাড়ী থেকে!

[হঠাৎ মঞ্জু হো হো করে হেসে উঠলো। তার হাসির শব্দে বিনোদ বাবু এবং তাঁর স্ত্রী অবাক হয়ে তাকালেন।]

গিন্নী। মরণ দশা আর কি! এত কাণ্ডর পরও একটু লজ্জা নেই—আবার হাসি আসছে। অমন অধঃপেতে মেয়ের মুখ দেখলেও পাপ হয়।

বিনোদ। সত্যি, হাসি আসছে কিসে তোর? এখনি যদি দূর করে দিই বাড়ী থেকে, তাহলে কোথায় যাবি, ভেবে দেখেছিস একবার?

মঞ্জু। বা রে, দেখেছি বৈকি! সোজা ধানখালির জমিদার বাড়ী চলে যাবো—আশুকাকা ত কথাবার্ত্তা পাকা করেই এসেছেন!

গিন্নী। তোর মতো হতচ্ছাড়া মেয়েকে তারা নিলে আর কি!

মঞ্জু। তুমি ভাবনা করো না মা, তাদের আমাকে ভারী পছন্দ হয়েছে—সত্যি বলছি।

গিন্নী। তার মানে?

মঞ্জু। তার মানে সেই জমিদার বাড়ীর ছেলেটিই দাঁড়িয়ে আছেন তোমাদের সাম্নে—অযোধ্যা চাকরের ছদ্মবেশ ধরে।

বিনোদ। অ্যাঁ, সে কি? তুই বলছিস কি রে?

মঞ্জু। ঠিকই বলছি বাবা। বিকেল বেলা নরেন রায় বলে এক জনের নামে সেই যে চিঠিখানা এসেছিল আমাদের ঠিকানায়—সে কে?

বিনোদ। তাই ত, তাই ত, খেয়ালই করি নি। ঠিক, ঠিক, নরেন রায়ই ত বটে নামটা। কিন্তু ব্যাপারটা কি তা ত বুঝতে পারছি না!

অযোধ্যা। আজ্ঞে, আমি চলে যাচ্ছি, এখুনি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

বিনোদ। না, না, এসেছো যখন, তখন চলে যাবে কেন? কিন্তু ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলো ত বাবা। বড়ই যে ধোঁকা লাগছে আমাদের!

অযোধ্যা। আজ্ঞে, আমি একটু মজা করবো বলেই চাকর সেজে এসে ঢুকেছিলাম আপনাদের বাড়ীতে।

বিনোদ। ছি, ছি, মানী লোকের ছেলে তুমি—তুমি আমাদের কত আদরের জিনিষ। না জেনে না চিনে তোমাকে দিয়ে করাই নি হেন কাজ নেই! এ রকম করে কি মজা করতে আছে বাবা?

গিন্নী। চিঠি এসেছিল, সেটা ত আমাকে বলতে হয় একবার। তোমারও যেন কিচ্ছু বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই!

বিনোদ। ওটা কেমন খেয়ালই হয়নি আমার। সত্যি, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। যাক গে, তুমি কিছু মনে করো না বাবা। চলো তুমি, আমার সঙ্গে ওপরে চলো।

[দু-জনের প্রস্থান]

গিন্নী। তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল, অমন চেহারা আর অমন চাল-চলন কখনো চাকরের হয়? তা তুইই বা বাপু কেমন মেয়ে? বলতে হয় একবার আমাকে—কি ঘেন্নার কথা বল ত!

মঞ্জু। আমিই কি জানতাম নাকি? আমাকেও ত খালি ভয় দেখাচ্ছিল ভূত সেজে—তাইতেই ত বিছানা থেকে উঠে এসেছিলাম ধরবো বলে! ধরেওছি, আর তোমরাও অম্নি এসে উঠলে!

গিন্নী। তাই নাকি? মাগো মা, কি কাণ্ড! আচ্ছা পাগলা ছেলে ত।


যথাস্থান

[নীলকণ্ঠ বাবুর বৈঠকখানা। দুপুরবেলা। পটল ও জীবনবাবু।]

জীবন। তাহলে আমি আসবো, সে কথা তোমার বাবা বলে গেছেন?

পটল। আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা বলে গেছেন, তিনি পাঁচটার মধ্যেই ফিরবেন। আপনি যেন ততক্ষণ··

জীবন। তা এখন বাড়ীতে আর কে আছেন?

পটল। এখন? মা আর আমি, আর দিদি, আর গোবর্দ্ধন চাকর।

জীবন। তোমার দাদারা?

পটল। আমিই ত বড়, আমার ত দাদা নেই।

জীবন। ও বটে, বটে, তা তোমার কাকা টাকা!

পটল। এখানে ত কেউ থাকেন না—মেজ কাকা থাকেন খুলনায়, ছোট কাকা বহরমপুরে।

জীবন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি যেন নাম তাদের, কি যেন!

পটল। মেজ কাকার নাম হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, আর ছোট কাকার নাম নরেন্দ্রনাথ···

জীবন। ঠিক, ঠিক, হরু আর নরু। কত ছোট দেখেছি সব। এখন বোধ হয় বেশ বড় সড়ো হয়েছে। তা কি করছে টরছে তারা?

পটল। মেজকাকা ওকালতি করেন, ছোট কাকা করেন প্রফেসারী।

জীবন। বেশ, বেশ। তা তোমার বাবার, কি বলে গিয়ে···

পটল। বাবার নাম? শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ···

জীবন। হাঃ হাঃ হাঃ! জানি, ওটা জানি বৈকি। তোমার বাবা যে আমার···

পটল। বঙ্গবাসী কলেজে বাবা ত আপনার সঙ্গে পড়তেন।

জীবন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ত জানো দেখছি!

[দরজায় চাবির আওয়াজ হতে পটল ভেতরে গেল, তখনি ফিরে এলো বাইরের ঘরে]

পটল। কাকাবাবু, মা বললেন, আপনি ততক্ষণ চান-টান সেরে নিন—খাবার এক্ষুণি হয়ে যাবে।

জীবন। আহা, সে হবে অখন। ও নিয়ে ওঁকে ব্যস্ত হতে বারণ করো। আগে আমি একটু বাথরুমে যাবো—সেই ব্যবস্থাটা করে দাও দিকি বাবা চট করে।

পটল। আচ্ছা, আসুন কাকাবাবু আমার সঙ্গে। এই গলিটা দিয়ে চলে যান—ঐ যে চৌবাচ্ছাটা, ঐখানেই··· [উভয়ের প্রস্থান]

[অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। সুবি, ও সুবি, একবারটি উঠে আয়ত সেলাই রেখে।

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। কি বলছো?

অন্নপূর্ণা। বঙ্কিম বাবু এসেছেন, বাথরুমে গেছেন—তুই এই ফাঁকে ষ্টোভটা ধরিয়ে তাড়াতাড়ি খান কতক লুচি আর আলু-বেগুন ভাজা করে ফেল দিকি, আমি গোবরাকে দিয়ে কিছু মিষ্টি আনিয়ে রাখছি দোকান থেকে!

শুভা। আমি বাপু আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরুবো—আজ আমাদের সিনেমায় যাবার কথা আছে।

অন্নপূর্ণা। পোড়ামুখো মেয়ে! ঘরের একটা কাজ করতে বললেই মুখ হাঁড়িপানা হয়। দিনরাত্তির খালি সাজাগোজা, নভেল পড়া, আর সিনেমা দেখা!

শুভা। হ্যাঁ, আর পড়াশুনা করি না? সংসারের কাজ করি না?

অন্নপূর্ণা। করিস আমার মাথা আর মুণ্ডু! ভদ্রলোক এসেছেন আমাদেরি জন্যে কষ্ট করে বর্দ্ধমান থেকে—এত বড় মেয়ে, তোর কি উচিত নয়, ওঁর ভালো করে আদর-যত্ন করা?

শুভা। অ্যাঁ, আজ বলে টার্জ্জানের সেকেণ্ড পার্টটা হচ্ছে—অলকদা কলেজ

থেকে ফিরেই আমায় নিয়ে যাবেন কথা রয়েছে—তা না, এখন বসে বসে তোমাদের বঙ্কিমবাবুর লুচি ভাজতে হবে!

অন্নপূর্ণা। এ আর কতক্ষণের কাজ? চটপট সেরে নে, নিয়ে যেখানে খুসী যা। আমি আর এই অবেলায় হাঁড়ি ধরতে পারছি না বাপু!

শুভা। হ্যাঁ, এতগুলো কাজ করে, তারপর জামাকাপড় বদলে যেতে হলেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা। তাহলে যা, এখুনি গিয়ে বসে থাকগে। লক্ষ্মীছাড়ী ধিঙ্গী কোথাকার!

শুভা। বাবা রে বাবা, করছি। ভারী খ্যাচখেচে হয়েছো তুমি আজকাল!

[প্রস্থান]

অন্নপূর্ণা। খোকন, গোবদ্ধনকে কর্ত্তার ঘরে বিছানা করে দিতে বলেছি—ওঁর মুখ-হাত ধোয়া হয়ে গেলে একেবারে ওপরে নিয়ে যাবি, বুঝলি। আর গোবরাকে একবার নীচেয় আসতে বলবি— দোকানে যাবে। [প্রস্থান]

[বাইরের ঘরে নীলকণ্ঠের প্রবেশ। গোবর্দ্ধন সেখানে বটুয়া খুলেছে।]

নীলকণ্ঠ। তোর মা কোথায় রে?

গোবর্দ্ধন। মা শুয়েছেন বোধ হয়।

নীলকণ্ঠ। ডাক দিকি একবার।

[গোবর্দ্ধনের প্রস্থান। একটু পরে অন্নপূর্ণার প্রবেশ।]

অন্নপূর্ণা। কি বলছো? একটু শোব ভাবছিলাম।

নীলকণ্ঠ। আরাম করেই শোওগে। বাঁকু আসতে পারবে না, তার ছোট মেয়ের ব্যারাম—অফিসে গিয়ে টেলিগ্রাম পেলাম, তাই তাড়াতাড়ি খবরটা দিতে এলাম তোমাকে।

অন্নপূর্ণা। বেশ করেছো।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা বিভ্রাট যাহক! আমারি কপাল, নইলে যেমন তাড়া-হুড়ো করছি, তেমনি একটা-না-একটা ব্যাগড়া এসে পড়ছে কেন এমন করে? ভালোয় ভালোয় বেচারীর মেয়েটা সেরে গেলে হয়। এদিকে ত আর সময় নেই, হঠাৎ বাজার নেমে গেলেই ব্যবসার দফা একদম রফা হয়ে যাবে!

অন্নপূর্ণা। ন্যাকামি রেখে এখন ওপরে যাও দিকি। ভদ্রলোক একা পড়ে আছেন ঘণ্টা খানেক থেকে।

নীলকণ্ঠ। ভদ্রলোক?

অন্নপূর্ণা। ভদ্রলোক কি ছোটলোক, তা তুমিই জানো। তোমারি ত বন্ধু।

নীলকণ্ঠ। কি বলছো সব পাগলের মতো?

অন্নপূর্ণা। আমার ত সব কথাই পাগলের মতো! তোমার সেই বঙ্কিম বাবু না কোন যম এসেছেন, খেয়ে দেয়ে ওপরের ঘরে পড়ে ঘুম দিচ্ছেন—দেখোগে গিয়ে!

নীলকণ্ঠ। তার মানে? বেলা আটটায় টেলিগ্রাম করেছে, আমি পেয়েছি বেলা এগারোটায়—এর মধ্যে সে বর্দ্ধমান থেকে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছে, ব্যাপারটা কি?

অন্নপূর্ণা। তা আমি কেমন করে জানবো? ওসব ঠাট্টা রাখো বাপু, আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

নীলকণ্ঠ। ঠাট্টা? আরে এইত টেলিগ্রাম, Last daughter's Cholera—Bankim.

অন্নপূর্ণা। রসিকতা করেছেন আর কি!

নীলকণ্ঠ। কিন্তু রসিকতা করার মানুষ ত সে নয়। আর এমন ভয়ানক কথা নিয়ে রসিকতা!

অন্নপূর্ণা। তা বাপু ওপরেই যাও না একবার। নিজে চোখে দেখে এলেই ত বুঝতে পারবে সব।

নীলকণ্ঠ। তাই যাই, এ তুমি বলছো কিগো? [প্রস্থান

অন্নপূর্ণা। সব তাতেই আদিখ্যেতা। বুড়ো বয়সে ভালো লাগে এ সব? [প্রস্থান

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। অলকদার কি একটুও বুদ্ধি নেই? আর ত রয়েছে মোটে দশ মিনিট—এর মধ্যে যাওয়াই বা হবে কি করে, টিকিটই বা কেনা হবে কখন? মিথ্যেই এত করে সাজগোজ করলাম। আচ্ছা আসুক, বোঝাচ্ছি মজাটা।

[পটলের প্রবেশ]

পটল। বেশ হয়েছে। আমায় নিয়ে যেতে বললাম, তা না বলে দেওয়া হল। এখন যা, টার্জ্জান দেখগে। অলকদা একাই চলে গেছে, তোকে নিয়ে যাবে না কচু।

শুভা। ভালো হচ্ছে না কিন্তু খোকন।

পটল। বা-রে আমি কি করেছি?

শুভা। তোকে কেউ টিপ্পনী কাটতে ডেকেছে?

পটল। টিপ্পনী কাটলাম কোথায়? আমি ত শুধু বলেছি, অলকদার সঙ্গে তোর

শুভা। হতভাগা কোথাকার। [পটলের এক দৌড়ে প্রস্থান। পিছু পিছু শুভা ছুটলো।]

[অন্নপূর্ণা ও নীলকণ্ঠের প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। ওমা সে আবার কি।

নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ, আমি বাঁকুকে চিনি না? আমার ছেলেবেলার বন্ধু, বছরে অন্তত পাঁচবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়—তার রং ধবধবে, এটা কালো মোষ, তার মাথায় টাক, এর কোঁকড়া চুল, সে রোগা, আর এ দিব্যি দোহারা—এ কেন সে হবে?

অন্নপূর্ণা। তা তুমি কি করলে ?

নীলকণ্ঠ। উপস্থিত ও-ঘরে ছেকল দিয়ে রেখেছি, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, তারপরে যা হয় করবো।

অন্নপূর্ণা। সে আবার কি ? লোকজন ডাকো, ঘরের ভেতর একটা বাইরের লোক পোরা থাকবে, এ আবার কেমন কথা ?

নীলকণ্ঠ। থামো, থামো, সব তাতেই অত উদ্ব্যস্ত হলে চলে না। আমি বাড়ী ছিলাম না, বাড়ীতে কোন ব্যাটা ছেলে নেই—এর ভেতর একটা বাইরের লোক এসে নেয়ে খেয়ে ঘুম দিচ্ছে, এ শুনলে লোকে তোমায় কি বলবে জানো ?

অন্নপূর্ণা। কি ঘেন্নার কথা !

নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ, সেই কথাই বলবে সবাই।

অন্নপূর্ণা। তা হলে কি করবে ? রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে, ঘরে ঢোকার উপায় কি হবে ?

নীলকণ্ঠ। রোস, রোস, অলক আসুক—সে চালাক চতুর ছেলে, তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করি, তারপর যা হয় করবো।

অন্নপূর্ণা। জানি না বাপু। [উভয়ের প্রস্থান

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। বাবার সব তাতেই অনাছিষ্টি ! বাইরের লোক কখনো পরের বাড়ী ঢুকে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুতে পারে ? এলো অলকদা, তাকে টেনে নিয়ে গেলেন পরামর্শ করতে। আর অলকদাও ত তেমনি—হুজুগ পেলে হয় !

[পটলের প্রবেশ]

পটল। দিদি, জানিস কি মজা হয়েছে ?

শুভা। জানি, জানি যা, সব বাজে কথা। দেখিস শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হবে, ইনিই বঙ্কিম বাবু। মধ্যে থেকে শুধু আমার সিনেমা দেখাটাই মাটি হল !

পটল। বেশ হয়েছে, আমি খুব খুসী হয়েছি। [উভয়ের প্রস্থান

[অলক, নীলকণ্ঠ আর পটলের প্রবেশ।]

অলক। আপনি যান, তুলে নিয়ে আস্থন। আমি নীচেয় আছি।

নীলকণ্ঠ। সাহস হচ্ছে না যে!

অলক। কিচ্ছু ভয় নেই, বরং একগাছা লাঠি হাতে করে যান, আর আমিও এক গাছা নিয়ে অপেক্ষা করি। তেমন-তেমন দেখলে, পিটিয়ে সিধে করে দেওয়া যাবে।

নীলকণ্ঠ। দাঁড়াও বাবা, আগে আর একটু তদন্ত করে নিই। কি মতলব নিয়ে এসে ঢুকেছে, হাতে কি হাতিয়ার-পাতি আছে, কিছুই ত জানিনে! হ্যাঁরে পটলা, তুই ভালো করে দেখেছিস, পিস্তল বন্দুক কিছু নেই টেই ত?

পটল। না বাবা, জামাটা খুলে হুকে রেখেই ত গেলেন, কোমরে কাপড়ের কষি ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না।

নীলকণ্ঠ। কিন্তু জামার পকেটে, কিংবা ট্যাঁকে ত কিছু থেকে থাকতে পারে। তা তুই কি করে দেখবি?

পটল। সে আমি জানিনে। না বাবা, কিচ্ছু নেই, তুমি বরং দেখো গে। খুব স্থন্দর গল্প বলে বাবা, ও কি কখনো বন্দুক ছুড়তে পারে?

নীলকণ্ঠ। তুই ত ভারী মানুষ চিনিস! তা এক কাজ কর দেখি— রান্নাঘর থেকে তিনখানা চেলা কাঠ নিয়ে আয়, একখানা আমায় দে, একখানা গোবরাকে দে, একখানা তুই নে। তারপর চল, তিনজনে একসঙ্গে ওপরে যাই, আর অলক নীচেয় থাকুক, কি বলো বাবা?

অলক। বেশ ত! [পটল ও নীলকণ্ঠের প্রস্থান]

[অলক জামার আস্তিন গুটিয়ে কাপড়ে মালকোঁচা দিলে, তারপর দরজার খিলটা খুলে সেটা ঘাড়ে নিলে।]

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। বা-বা বেশ চেহারা খুলেছে, ঠিক যেন একটি বিনা মাইনের বরকন্দাজ !

অলক। কি করব বলো ? তোমার বাবা যে কাণ্ডটি বাধালেন !

শুভা। যান আপনি ভারী ইয়ে ! একটু আগে এলে কি হত ? তা হলে কোন কালেই চলে যাওয়া যেতো, এসব ফ্যাসাদের মধ্যে পড়তে হত না আর !

অলক। একটু বিশেষ কাজে দেরী হয়ে গেল। সত্যি, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে আমার !

শুভা। অ্যাঁ, অন্যায় হয়ে গেছে ! তা সাড়ে ছ'টার শোতে যাওয়া হবে ত, না সেটাও গেল ?

অলক। নিশ্চয় হবে। আলবৎ হবে। একদম বিশ্বে ছুঁয়ে বলছি !

শুভা। হ্যাঁ, সে কথাটার কি হল ?

অলক। আছে খবর। সিনেমায় গিয়ে বলবো।

শুভা। আমি চায়ের জল চাপিয়ে এসেছি, এখন চললাম, আপনি ততক্ষণ দারোগাগিরি সেরে নিন। [প্রস্থান

[চেলা কাঠ হাতে নীলকণ্ঠ, পটল ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ। সঙ্গে সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা জীবনবাবু। ঘন ঘন হাই উঠছে।]

নীলকণ্ঠ। ওসব কথা শুনতে চাইনে। আপনি কি জন্যে ভরা দুপুর বেলা ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকেছেন, তাই শুনি। এ কি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা পেয়েছেন ? জানেন আপনাকে···

অলক। এ্যাঁ ? বাবা ?

জীবন। তুই এখানে ? কি সর্ব্বনাশ !

অলক। আমি ত এই বাড়ীতেই পড়াই, ইনিই ত নীলকণ্ঠবাবু।

জীবন। রক্ষে হক! আমি ভাবছিলাম, বুঝি বাপ-ব্যাটা দু-জনেই এক জালে জড়িয়ে পড়েছি!

নীলকণ্ঠ। ব্যাপার কি অলক? ইনি তোমার…

অলক। আজ্ঞে, আমার বাবা। [প্রস্থান। পিছু পিছু পটল এবং গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।]

নীলকণ্ঠ। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

জীবন। দাঁড়ান, দাঁড়ান, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এসেছিলাম সিমলা ষ্ট্রীটে একটু কাজে, হঠাৎ বাথরুমের দরকার হয়ে পড়ল। কি করি? কাছে-ভিতে পার্ক নেই, আশে-পাশে চেনাশুনো লোক নেই—বেগতিক দেখেই ঢুকে পড়লাম আপনার বাইরের ঘরে। ছোট ছেলেটি খেলা করছিল, ভাবলাম, তাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যবস্থা করে নোব। তা আমি ঢুকতেই খোকাটি খুব অভ্যর্থনা করলে। বললে, বাবা বলে গেছেন, আপনি এলে যেন আপনার নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, বাবা ফিরবেন পাঁচটায়। বুঝলাম, কারুর আসার কথা আছে, তিনি আসেন নি, আর তাঁকে এরা চেনেও না। ভাবলাম, এই ত সুযোগ! কার্য্য সেরে সরে পড়বারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যে পরিমাণ আদর-যত্ন লাভ হল, তাতেই বেসামাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর ধরাও পড়ে গেলাম তাইতেই।

নীলকণ্ঠ। হাঃ হাঃ হাঃ, করেছেন ত মন্দ নয়। তা ওরা একটুও ধরতে পারলো না? পারবে কি করে? আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল কিনা —ওরা তৈরী ছিল সেইজন্যে। এদিকে অফিসে গিয়ে টেলিগ্রাম পেলাম, সে আসতে পারবে না। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে সেই খবর দিতে এসে শুনলাম, সে এসেছে। বুঝুন তখন আমার অবস্থাটা! তা না চিনে বড়ই…

জীবন। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দু-পক্ষেই একটু রঙ্গ করে নেওয়া গেল, মন্দ কি?

নীলকণ্ঠ। দেখুন, অলককে আমরা ছেলের মতোই দেখি। আপনি তার বাবা, আপনি ত আমাদের পরমাত্মীয়।

জীবন। বটেই ত। আপনাদের কথা প্রায়ই শুনি খোকার মুখে। দৈবে আজ আলাপ হয়ে গেল, ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু!

নীলকণ্ঠ। দেখুন, আপনার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হবে বলেই দৈব এই যোগাযোগ ঘটিয়েছেন। নইলে এতগুলো জিনিষ এক সঙ্গে হবে কেন? বাঁকু আসতে পারলো না, আমাকে বেরুতে হল, আপনার অমন একটা দরকার হয়ে পড়লো—এ থেকে কি বিধাতার গভীর একটা উদ্দেশ্যেরই আভাষ পাচ্ছেন না আপনি?

জীবন। না ত।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা চলুন ওপরে, সব বুঝিয়ে বলছি।

জীবন। ভোম্বল কোথায়?

নীলকণ্ঠ। কে, অলক? সে তার কাকীমার সঙ্গে গল্প করছে বোধ হয়। আসুন, আপনি ওপরে আসুন। ওরে ওপরে তামাক দে। [উভয়ের প্রস্থান]

[অলক আর শুভার প্রবেশ]

অলক। চলো, চটপট বেরিয়ে পড়ি, নইলে হয়ত এখনি ডাক পড়বে।

শুভা। ভালোই ত হবে, সাম্নাসাম্নি পাকা কথা হয়ে যাবে।

অলক। যাঃ, তাই কখনো পারা যায়?

শুভা। কেন, তখন যে বলতেন, আমার জন্যে কারুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই আপনার ভয় নেই!

অলক। মুখে বলা, আর কাজে করা···

শুভা। তা আমি জানতাম, তাইতেই দিন-রাত ভয়ে আমার গা ছম ছম করত।

অলক। এখন ভয় ভেঙেছে ত?

শুভা। তা ভেঙেছে, কিন্তু সে ত ভেঙে দিলে দৈব। আপনার বাহাদুরীটা কোথায়? যাক, এখন চলুন, সন্ধ্যার শো'ও যদি দেখা না হয়, তাহলে কিন্তু…

অলক। না না চলো, আর দেরী নয়। [উভয়ের প্রস্থান]

[অন্নপূর্ণা ও পটলের প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। কি বলছে? মত করেছে ত বিয়েতে?

পটল। ইস, মত করবে না? ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙে দোব না তাহলে!

অন্নপূর্ণা। চুপ কর গাধা ছেলে, ওকথা বলতে আছে?

[গোবর্দ্ধনের প্রবেশ]

গোবর্দ্ধন। মা, ওপরে আসুন, বাবু ডাকছেন।



[রামকালীর বাড়ীর দরজা আটক করে দাঁড়িয়ে নীরদা। সামনে অফিস -ফেরৎ রামকালী। রাত্রি অনুমান ন'টা।]

নীরদা। কোথা থেকে আসা হল এতক্ষণে? এই দুপুর রাত্রে পথে দাঁড়িয়ে মাতালের মতো হৈ-হৈ করতে লজ্জা করে না? ঘরে মেয়েটা জ্বরে ধুঁকছে, বুড়ো বয়সে…

রামকালী। আঃ কি বকাবকি করো? অফিসের কাজে দেরী হয়ে গেছে। ছাড়ো, ভেতরে ঢুকতে দাও।

নীরদা। কচি খুকী পেয়েছো, না? এই রাত্তির এগারটা পর্য্যন্ত তোমার জন্যে অফিস খোলা ছিল! সেই কোন ছটায় জয়ার বাবা ফিরেছে, এতক্ষণে তাদের এক ঘুম হয়ে গেল! কোথায় গিয়েছিলে শুনি, নইলে কিছুতেই আজ তোমায় ঘরে ঢুকতে দোব না জেনো।

রামকালী। ভদ্র ঘরের বৌ হয়ে রাস্তায় এসে গলাবাজী করছো, তোমার লজ্জা করে না? সকাল থেকে সন্ধ্যে ইস্তক খেটে খেটে আমার হাড়ে দুব্বো গজাবার জোগাড় হয়েছে, আমার ত সখ উথলে উঠছে! নাও, পথ ছাড়ো।

নীরদা। ছাড়ো বললেই ছাড়লাম আর কি!

রামকালী। কি হচ্ছে? ঘর নেই? ঘরে গিয়ে চেঁচালে কি সর্ব্বনাশটা হবে? পথে দাঁড়িয়ে এই খিটকেল করা দেখলে পাড়ার লোক গায়ে থুথু দেবে না তোমার?

নীরদা। দিক, আমি ত তাই চাই। তোমার হাতে যে পড়েছে, তার আবার লজ্জা, তার আবার সরম!

রামকালী। বটে? বেশ, দেখি কে আমার কি করে! কোন ব্যাটাকে আমি ভয় করি?

নীরদা। তা করবে কেন? দু-কান কাটার আবার ভয় থাকে? মেয়েটার অসুখ, ওষুধ কিনতে গিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট গোল্লায় দিয়ে নাচতে

নাচতে এসে বলতে পারো, হারিয়ে গেছে। রাত্তির এগারোটায় বাড়ী ফিরে এসে, ভালো মুখ করে বলতে পারো, অফিসে ছিলাম! তোমার কি লজ্জা আছে?

রামকালী। দেখো নীরদা, ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

নীরদা। হক না মন্দই। স্বামী যার মাতাল, বয়াটে, তার আর মন্দর বাকীটা কোথায়?

রামকালী। কি, আমি মাতাল? বয়াটে? নীরদা!

নীরদা। ইস, মারবে নাকি? বলে, দরবারে না মুখ পাই, ঘরে এসে বৌ কিলাই! আমায় উনি ন্যাকা বোঝাবেন! আমার মামা কলকাতা সহরের সমস্ত মদ একা পেটে পুরে লিভার পেকে মরেছে, আমি মদের গন্ধ চিনি না?

রামকালী। লজ্জা হয় না একটু গুরুজনকে মাতাল বয়াটে বলতে? সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির ওপর এই রকম ব্যবহার, পরকাল নেই?

নীরদা। আমার আবার পরকাল! আমার পরকাল ত তুমিই ঝরঝরে করেছো!

রামকালী। তোমাকে কোন নিশ্চিন্দিপুরের কুমার বাহাদুর নিকে করতে আসতো শুনি?

নীরদা। না আসতো, নাই আসতো! এর চেয়ে আইবুড়ো থাকা ঢের ভালো ছিল।

রামকালী। বিধবা হওয়া?

নীরদা। হ্যাঁ, তাও!

রামকালী। এ্যাঁ, এত বড় কথা? আচ্ছা দেখে নিচ্ছি, আজ তোমায় বিধবা না করি ত আমার নাম রামকালীই নয়! এতখানি সাহস হয়েছে তোমার? চললাম আমি বাড়ী থেকে।

নীরদা। যাও, আরো দু-ভাঁড় খেয়ে একেবারে ভোর রাত্তিরে চোখ রাঙা করে ফিরে এসো।

* * *

[লেকের ধারে রামকালী বসে আছে। একটি লোক তার পাশে এসে বসলো।]

লোক। বিড়ি আছে দাদা, বিড়ি?

রামকালী। বিড়ি? না।

লোক। ক'টা বাজল বলতে পারেন?

রামকালী। আঃ, আচ্ছা আপদ হল ত! সাড়ে দশটা হবে বোধ হয়।

লোক। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন দাদা? দোহাই আপনার, রাগ করবেন না। আমি বড় দুঃখী!

রামকালী। আমার দুঃখের খবর কে নেয় তার ঠিক নেই, আমায় এসেছেন উনি দুঃখের কথা শোনাতে!

লোক। আচ্ছা দাদা বলতে পারেন, আত্মহত্যা করা যায় কি করে?

রামকালী। আত্মহত্যা! বলেন কি?

লোক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাই করবো।

রামকালী। কেন, ব্যাপার কি মশায়?

লোক। ব্যাপার? ওয়াইফের সঙ্গে বনিবনা হয় না, রাদ্দিন ঝগড়া-ঝাঁটি, কাঁহাতক আর ভালো লাগে দাদা?

রামকালী। লোকটা কি রাস্তা থেকে নীরদার কাণ্ড সব দেখেছে? আর তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে এসেছে? নইলে একই সময় একই জায়গায় একই ব্যথায় ব্যথী দু-জন আসবে কি করে?

লোক। কি বলবো দাদা, একটু সাহিত্যের বাতিক আছে। অফিসের ফেরৎ তাই এক-এক দিন একটু এদিক-সেদিক যাই। এই নিয়ে সন্দেহ, তাই

থেকে ঝগড়া। কেরাণীগিরি করি, দু-তিনটি ছেলে-মেয়ে হয়েছে, দেখুন দিকি আদিখ্যেতাটা একবার!

রামকালী। নাঃ. ভুল করেছিলাম। এ বেচারী দেখছি আমারই মাসতুত ভাই। আরে ভাই মেয়েমানুষের দস্তুরই এই, ওরা অতি যাচ্ছেতাই!

লোক। তা আর বলতে! কথায় কথায় বলে, চাইনে। আরে চাসনে ত বলিস, কিন্তু এখুনি যদি চোখ বুঁজি, তাহলে ন্যাড়া হাতে থান পরে আর একাদশী করে মরবি, তা জানিস?

রামকালী। তাতে কি ওদের ভয় আছে রে ভাই? ও বইয়েই লেখে সরলা, অবলা, কোমলা···কিসসু নারে ভাই কিসসু না।

লোক। যা বলেছেন দাদা! তা আপনার ওয়াইফটি কেমন?

রামকালী। তা ভাই আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার ও-ভাগ্যিটা মন্দ নয়। আমরা ল্যভে পড়ে বিয়ে করেছিলাম কিনা!

লোক। আমিও দাদা ল্যভেই পড়েছিলাম, কিন্তু ওমা, যেই বিয়ের মন্তর পড়লাম, অম্নি কোথা দিয়ে সব ল্যভ যেন কর্পূরের মতো উবে গেল!

রামকালী। তাই ত!

লোক। তা দাদা আপনি কি বলেন? আমার মরাই উচিত কি না?

রামকালী। উঁহুঁ, মলে ত শেষই হয়ে গেল সব! আর একটা বিয়ে করে জব্দ করে দেওয়া উচিত।

লোক। দি আইডিয়া! কিন্তু এই বয়সে আর কি কেউ বিয়ে দেবে? তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, বৌ ঝগড়াটে বটে, কিন্তু ডাক-সাইটে সুন্দরী!

রামকালী। তাই নাকি? তাহলে আমি বলি কি, আপনার বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভালো।

লোক। কেন, কি সুখে? আপনি এমন হৃদয়হীন দাদা? জানেন সে

কি করেছে ? সোজা আমার গালে চড় বসিয়ে দিয়েছে ঝগড়া করতে করতে ! তার মুখ আর আমি দেখবো এজীবনে ?

রামকালী। আপনি না বললেন, আপনি লাভ করে বিয়ে করেছেন, আর আপনার স্ত্রী খুব সুন্দরী ?

লোক। হ্যাঁ তাঁই ত। আপনি কি ভাবছেন, মিছে কথা বলেছি ?

রামকালী। না না, তা নয়, আমি বলছি কি, আপনি ঝগড়া করে চলে আসায় তিনিও ত অভিমানে আত্মহত্যা করে বসতে পারেন !

লোক। না না···এঁ্যা···সে কি ? সে কি ? তাহলে আমি মরে যাবো।

রামকালী। তাই ত বলছি, আপনি বাড়ী ফিরে যান।

লোক। তা মন্দ বলেন নি দাদা। বৌ অভিমানী বটে, আবার সুন্দরীও বটে ! বাড়ীই যাই দাদা, কথাটা আমার বেশ মনে লাগলো। আচ্ছা, নমস্কার দাদা, কিছু মনে করবেন না।

[প্রস্থান]

রামকালী। ইস, ঘরে ঘরে পুরুষদের আজ কি দুর্দ্দশা ! হতভাগা কাগজওয়ালারা বলে, মেয়েরা পরাধীন ! দেখে যাক তারা, ঘর-বাড়ী, ছেলেপুলে সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে কত সহজে মেয়েরা পুরুষদের পথে নামিয়ে দিতে পারে ! সত্যিকার পরাধীন হল পুরুষ মানুষরাই।

* * * *

[নীরদা গলায় আঁচল বেঁধে আনলার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে হতভম্ব রামকালী]

রামকালী। নীরদা, ও কি হচ্ছে ?

নীরদা। কি আবার ? আত্মহত্যা করছি।

রামকালী। সে কি ? কেন, কেন ?

নীরদা। কেন ? কি জন্যে তুমি আমাকে এমন করে জ্বালাবে ? কেন

রাত দুপুর পর্য্যন্ত বেপাড়ায় আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফিরবে, আর তাই বলতে গেলে আমায় তেড়ে মারতে আসবে ?

রামকালী। রাত দুপুর কোথায় ? সবে ত পৌনে ন'টা। ফেরবার পথে দাশুর ওখানে দু-বাজী দাবা খেলেছি, তাইতেই একটু দেরী হয়ে গেছে। অন্য কোথাও যাইনি, সত্যি বলছি তোমাকে। আর তেড়ে মারতে যাওয়া বলছো, কৈ, কিছুই ত আমি বলিনি !

নীরদা। বলো নি ? মিছে কথা বলতে লজ্জা কচ্ছে না ? কি সুখেই রেখেছো ! আর আমি বাঁচতে চাইনে, কিছুতেই না !

রামকালী। মাপ করো নীরু, মাপ করো। আত্মহত্যা বড় ভয়ানক জিনিষ, ও-কথা মুখেও বলতে নেই। এই সংসার, এই ছেলে-মেয়ে, সব ভাসিয়ে দিয়ে, বুড়ো বয়সে আমাকে···না নীরু, লক্ষ্মীটি !

নীরদা। বটে ? যখন বয়েস কম ছিল, তখন কোনদিন উঁচু কথাটি বলতে শুনিনি, আর এখন সব তাতেই তম্বি ! চালাকি পেয়েছো, না ?

রামকালী। না নীরু, আর কখনো হবে না, কক্ষনো না। আত্মহত্যা ! ওরে বাপ, লোক-জন, পুলিশ-পেয়াদা, কি কাণ্ড একবার ভাবো ত ! দোহাই তোমার, আর আমাকে দুঃখ দিয়ো না।

নীরদা। আমাকে যখন দুঃখ দাও···

রামকালী। এই কান মলছি নীরু, আর কোনদিন যদি···

নীরদা। ঠিক মনে থাকবে ?

রামকালী। থাকবে।



[বালীগঞ্জের এক সমৃদ্ধ বাড়ীর বাইরের ঘর। নীরা ও নির্ম্মল।]

নির্ম্মল। তারপর ?

নীরা। তারপর আর কি ? মা দেখলেন, ছেলেটি ভালো, আমরাও দু-বোনই রীতিমতো অরক্ষণীয়া। যদি হিল্লে লেগে যায়, এই মনে করে মধ্যে এনে ছেড়ে দিলেন ওঁকে, আর উনিও দু-জনকে নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা সুরু করলেন।

নির্ম্মল। সে পরীক্ষায় তুমিই বুঝি ফুল-নম্বর পেলে, আর বেচারা দিদি নিতান্তই ফেল করে বসলো !

নীরা। দিদি পরীক্ষাই দিলে না আদতে। জানো ত অভ্যাস তার—মনের কপাট তার বাইরে থেকে খুলবে, এমন মানুষই নেই ভূ-ভারতে। আর ভদ্রলোকটিও এমন বাক-চাতুরী যাই করুন, মনের পাঁচীরে সিঁদ কাটার মতো পৌরুষ ওঁর নেই। কাজেই কি আর করেন ? নিরুপায় হয়েই শেষটা ঢলে পড়লেন আমার দিকে—দিদি আর মা-ও তাতে দু-হাতে ইন্ধন যোগাতে লাগলো।

নির্ম্মল। বুঝলাম, কিন্তু তোমার মনের কথাটা কি, তা শুনতে পাই কি ?

নীরা। এটা আর বুঝলে না ? এমন একটি ইন্টেলিজেন্ট ইয়ং ম্যান, অত মিষ্টি চেহারা—সে আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, এতে আমি খুসী হবো না, আমি কি এতই বোকা ?

নির্ম্মল। হুঁ। কিন্তু তাহলে আবার আমাকে কাঁটায় গেঁথে খেলাবার মানেটা কি ? ঘরে একটি, বাইরে একটি, এক সঙ্গে দুটি প্রেমিক নিয়ে লীলা চালানোর মৎলবে বুঝি ! কিন্তু আমি ত নিতান্তই ডালার্ড, আমার চেহারাও ত কাঠ-খোট্টার একশেষ !

নীরা। আহা, সেই জন্যই ত তোমাকেও দরকার। দুই এক্সট্রিমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করছি, কাকে হৃদয় দোব, বুঝলে না !

নির্ম্মল। বটে?

নীরা। কেন, তাতে দোষের কি হল? মেয়েদের কি আর তুলনামূলক পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাচাই করে নিতে নেই? ওটা বুঝি পুরুষদেরই একচেটে?

নির্ম্মল। বলতে পারি না, তবে আমি তোমার পরীক্ষার সাবজেক্ট হতে নারাজ। আমাকে এখানেই বিদায় দাও। ঐ ইণ্টেলিজেণ্ট মিষ্টি চেহারা নিয়েই খুসী হও তুমি, I wish you success and good cheer!

নীরা। অত প্যানপেনে হলে ত চলবে না স্যার। আমি দেখছি, তোমাদের মধ্যে সত্যিকার পুরুষ কে—যে তা হবে, আমি তারি।

নির্ম্মল। তার জন্যে কি শেষ পর্য্যন্ত ডুয়েল লড়তে হবে?

নীরা। হতে পারে বৈকি। তবে আপাতত দু-জনে একটু আলাপ-পরিচয় হলেই চলবে।

নির্ম্মল। আলাপ? এক্সকিউজ মি, যদি ভদ্রলোক না হতাম, তাহলে তাকে আমি···

নীরা। ইস, কি হিংসে! না গো না, ভয় নেই তোমার। তোমার সাত-রাজার-ধন মাণিকটি কেউ লুঠ করে নিচ্ছে না!

নির্ম্মল। ভরসাই বা কি? দিনের পর দিন দেখছি, আমার সঙ্গে এপয়েণ্ট-মেণ্ট করছো, আমি এসে বেকুবের মতো বাইরের ঘরে ধন্না দিয়ে বসে থাকছি, আর তুমি তখন কার সঙ্গে কোথায় ফূর্ত্তি ওড়াচ্ছো কে জানে! এ খেলার মানেটা কি? এ আর চলবে না—এস্পার-ওস্পার যা করার, আজই করতে হবে তোমাকে।

নীরা। আচ্ছা, আচ্ছা, আর রাগ ফলাতে হবে না। আজই ফাইনাল করে ফেলবো। দেখো, সত্যি বলছি। বাড়ী থেকে পোষাক বদলে এসো তুমি। তারপর তুমি যেখানে যেতে বলবে, সেখানেই যাবো—নরকে যেতে হলেও না বলবো না।

নির্মল। বেশ, আর একটা চান্সও দিলাম। এই কিন্তু শেষ চান্স, মনে থাকে যেন! [প্রস্থান]

নীরা। আচ্ছা। [টেলিফোন বেজে উঠলো।] হ্যালো? হ্যাঁ আমি। বেশ ত, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি—আধ-ঘণ্টার মধ্যেই আসা চাই কিন্তু। না, না, কেউ আপত্তি করবে না। পাগল! তাই কখনো হয়? আচ্ছা, আচ্ছা।

[ফোন ছেড়ে দিতেই ধীরা ঘরে এলো।]

ধীরা। দেখ নীরু, তুই কখন কার সঙ্গে এপয়েণ্টমেণ্ট করিস, কিচ্ছু মনে থাকে না তোর। তারপর তারা এসে আমার কাছে কেঁউ কেঁউ করে।

নীরা। দিতে পারো না তুমি পত্রপাঠ বিদায় করে?

ধীরা। কে তোর প্রাণের বন্ধু, কে নয়, কিছু না জেনে, বিদায় করে দিয়ে কি শেষটা ফ্যাসাদে পড়বো? আমাকে এই এনকোয়ারী-অফিসে বসিয়ে রেখে আর দুর্ভোগ ভোগাস নে ভাই। সত্যি বলছি, ভীষণ বিশ্রী লাগে আমার।

নীরা। বিশ্রী কেন দিদি? এই সুযোগে তুমিও ত দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলতে পারো দু-একজনের সঙ্গে!

ধীরা। রামো চন্দর! সে ক্ষমতা কি আমার আছে? তাহলে কি আর এতদিন আসর ফাঁকা যেতো?

নীরা। আচ্ছা দিদি, সত্যি করে বলো ত, তুমি কারুকে ভালোবাসো কি না? কোন লোককে?

ধীরা। বাসি বৈকি!

নীরা। কে সে?

ধীরা। সে এক বিহ্বল প্রেমিক—চোখে তার নীল সাগরের স্বপ্ন, মুখে রামধনু-লোকের মায়াময় দীপ্তি। বেশ ভালো প্রেমিক, কি বলিস?

নীরা। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, হেঁয়ালী বন্ধ করো। ও আমার সহ্য হয়

না! রূপকথার রাজকুমার, ও রূপকথাতেই থাক—দিনের আলোয় যা-হক একটা সোজা মানুষ খুঁজে নাও যে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি!

ধীরা। তোর না বাঁচার কি হলো নীরু? তুই ত দিব্যি আছিস! সবাই তোকে ভালোবাসার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে, আর তুইও দেখছি, সুযোগ বুঝে সব্বাইকে খাসা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিস!

নীরা। মন্দ কি করছি দিদি? বোকা বলদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে ভালো লাগে না কার? কিন্তু তুমি বোধহয় জানো না যে তোমাকেও একজন ভালোবাসে!

ধীরা। আমাকে? বলিস কি নীরু? কার এমন অধর্ম্মের ভোগ হল?

নীরা। ঠাট্টা নয় দিদি, সত্যি বলছি। তার নামও বলতে পারি তোমাকে।

ধীরা। বল ত শুনি।

নীরা। অমুতোষ।

ধীরা। ছি নীরু, কালও মা তোদের বিয়ের কথা বলছিলেন। ও-সব ঠাট্টা ভালো নয়!

নীরা। লক্ষীটি দিদি, ভুল বুঝো না। সাহস করে ও কোনদিন নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না তোমার কাছে, বাইরে ও শুধু আমাকেই ভালোবাসার ভাণ করে, কিন্তু ওর ভালোবাসার আসল লক্ষ্য তুমি—আমি নিতান্তই একটা উপলক্ষ্য, এ আমি বেশ করে যাচিয়ে দেখেছি। আর সেইজন্যই ত আমি নিজের পথটা গোড়া থেকেই খোলা রেখেছি।

ধীরা। এ সব তোর অনুমান নীরু, অবশ্য প্রমাণেরও দরকার নেই আমার। আমি বেশ আছি। আমি ত ভালোবাসার কাঙাল নই নীরু, ও জিনিষ আমি চাইনি কোন দিনই!

নীরা। ভালোবাসার কাঙাল সব মেয়েই দিদি। ভালোবাসা দিতে আর পেতে চাও না তুমি, এই কি সত্যি কথা হল?

ধীরা। বলেছি ত তোকে, সেই জন্যেই ভালোবাসি আমি মায়াপুরীর রাজপুত্রকে।

নীরা। রক্ষে করো দিদি, আবার সেই রাজপুত্র! ঐ ঐ সে আসছে—আমি পালালাম। দোহাই তোমার দিদি, ওকে বলো, আমি ক্লাবে গেছি, আর একটা দিন শুধু ওকে আটকে রাখো তুমি আমার হয়ে। [প্রস্থান]

[অনুতোষের প্রবেশ]

অনুতোষ। নমস্কার।

ধীরা। নমস্কার, আসুন।

অনু। নীরা কোথায়?

ধীরা। নীরা বোধ হয় ক্লাবে গেছে, একটু পরেই ফিরবে।

অনু। ক্লাবে? এই ক'মিনিট আগে যে আমায় ফোনে বললে, ছ'টায় আসতে।

ধীরা। তা ত বলতে পারি না আমি।

অনু। আপনার পারবার কথাও নয়। কিন্তু মানুষকে অনর্থক হয়রান করা যে ঠিক নয়, এ বোধহয় আপনিও স্বীকার করবেন।

ধীরা। বসুন, এখুনি আসবে হয়ত। ভারী অন্যায় এ রকম করা—আসতে যখন বলেছে, তখন অপেক্ষা করাই উচিত ছিল তার।

অনু। করেনি, তার কারণ সে ভেবেছে, আমাকে কাঁটায় গেঁথে খেলাচ্ছে সে। কিন্তু আমি যে ছিপ-শুদ্ধ তাকেও জলে নামাতে পারি, এ বোধহয় মাথায় আসেনি তার!

ধীরা। রাগ করলে কি চলে? ছেলেমানুষ!

অনু। ছেলেমানুষ হতে পারে, কিন্তু এটুকু ভদ্রতা শেখার বয়স তার হয়েছে বৈকি! আচ্ছা চললাম আমি। তাকে দয়া করে বলবেন যে এখানেই তার সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ শেষ হল!

ধীরা। শেষ বললেই কি শেষ হয়? চা খান ততক্ষণ, ও আসুক, খুব বকবো খুনি আজ। হরিপদ, চা দিয়ে যা ত বাইরে।

অনু। চা? আচ্ছা দিন।

[ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে গেল। ধীরা চা তৈরী করতে লাগলো নিঃশব্দে।]

ধীরা। মুখটা অমন অপ্রসন্ন করে রাখছেন কেন?

অনু। না, অপ্রসন্ন আর কি? দেখুন, নীরা বোধহয় মনে করেছে যে আমি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি, তাইতেই আমাকে সে···

ধীরা। নীরা কেন, আমরাও ত তাই মনে করি।

অনু। ভুল মনে করেন ধীরা দেবী, একদম ভুল। নীরাকে আমি একেবারেই ভালোবাসতে পারিনি, আর সে-ও পারেনি আমাকে ভালো-বাসতে। এতদিন আমরা শুধু ভালোবাসার নামে পরস্পরের কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে চলারই প্রতিযোগিতা করেছি। আজ এসেছিলাম এই ছেলে-খেলার শেষ করে ফেলবো বলে।

ধীরা। কিন্তু কি এর কারণ?

অনু। যতদূর বুঝেছি, নীরা আর কারুকে ভালোবাসে এবং সত্যিকার অনুরাগ তার তারি ওপর। আমাকে সে চায়ও নি, আর পায়ও নি সেই জন্যে।

ধীরা। আর আপনি?

অনু। আমি? ছিল কিছু আমারও বলার, কিন্তু ধীরা দেবী, লাভ কি তাতে?

ধীরা। আপত্তি থাকে ত বলবেন না।

অনু। আপত্তি কিছু নেই, শুধু আছে একটু লজ্জা।

ধীরা। বলুনই না। আমাকে কি সামান্য একটা বন্ধুর গৌরবও দিতে পারেন না আপনি?

অনু। তার চেয়ে অনেক বেশীই দিতে চেয়েছিলাম ধীরা দেবী, কিন্তু আপনি নিলেন কৈ?

ধীরা। নেবার জন্যে হাত পেতেই ছিলাম আমি, কিন্তু দেবার জন্যে যে এসেছেন, তা ত বুঝতে পারলাম না একদিনও!

অনু। মাঝখানে নীরা এসে দাঁড়ালো বলেই কি?

ধীরা। হয়ত তাই, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, নীরুকে আপনিও চেয়েছেন।

অনু। মোটেই না। নীরু বুঝতে পেরেছিল আমার মনকে। সাহসের অভাবে পাছে আমি আপনার কাছ থেকে দূরে গিয়ে পড়ি, তাইতেই সে এগিয়ে এসেছিল আমাকে আটকে রাখার জন্যে।

ধীরা। ভালোই করেছিল নীরু, নইলে হয়ত কোনদিনই ধরা দিতেন না আপনি।

অনু। কিন্তু এ ত শুধু একপক্ষের ধরা-দেওয়ার ব্যাপার নয় ধীরা দেবী!

ধীরা। আর এক পক্ষ কি করলে খুসী হন আপনি? 'তোমায় খুব ভালোবাসি' বললে? না, মুখে কাপড় গুঁজে খানিকটা ফুঁপিয়ে কাঁদলে?

অনু। না হয় একটু বললেই, কিংবা একটু কাঁদলেই নাহয়। ধীরা, তোমাকে আমি···

ধীরা। চুপ, নীরু আসছে।

[নীরা ও নির্ম্মলের প্রবেশ]

নীরা। দিদিকে ত তুমি চেনোই। ইনি হচ্ছেন অনুতোষ সরকার, কবি, এবং আমার ভাবী···

ধীরা। মার খাবি কিন্তু নীরু।

নীরা। কেন, রূপকথার কুমার কথা ছেড়ে যখন বাস্তবে রূপ নিয়েছেন, তখন আর একটু সাহস করে সেটা মেনেই নাও না দিদি।

অম্বু। তুমি কিন্তু নীরু খুব হুঁসিয়ার মাঝি, নইলে এ তরী মাঝ-নদীতেই বানচাল হত, কোন দিনই আর কিনারায় পৌঁছুতো না।

নীরা। লগি ঠেলার মজুরীটা এবার কি দিচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, তুমি যে একেবারে স্পিকটি নট হয়ে রইলে? এখনো ডুয়েল লড়ার মৎলব রয়েছে নাকি?

নির্ম্মল। রামো চন্দর! এখন আমি সানন্দে করমর্দ্দন করতে প্রস্তুত।

অম্বু। আসুন, হাতাহাতিটা হয়ে যাক তাহলে।

নীরু। চলো দিদি, আমরা একটু ছাদে যাই।

ধীরা। আর এঁরা?

অম্বু। ভয় নেই, আমরা এখানেই ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পারবো।

নির্ম্মল। তা পারবো বৈকি! বিনা আশাতেই এতদিন পেরেছি অপেক্ষা করে থাকতে। এখন ত রোদ উঠেছে, ঐ দেখা যায় আলো!

[সকলের গান]

রোদ উঠেছে, ঐ দেখা যায় আলো।
সবই ভালো, শেষ যদি হয় ভালো।
এসো ধরি পরস্পরের হাত,
নেচে-কুঁদে আসর করি মাত,
পেষ্ট্রি-পুডিং চালাও যত খুসী—
তারি সঙ্গে গরম কফি ঢালো॥


এদিক-ওদিক

[মায়া সম্প্রতি ফিরেছে প্রসূতি হাঁসপাতাল থেকে। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে প্রবীর খবরের কাগজ দেখছে, আর মায়া তারি পাশে একটা মোড়ায় বসে লেস বুনছে। বড় ছেলে বিশু দম-দেওয়া মোটরকার নিয়ে একমনে খেলায় ব্যস্ত। বেলা তখন প্রায় দুটো হবে।]

মায়া। ইস, এমন ভয় হয়েছিল আমার, যখন ডাঃ চৌধুরী বললেন ফরসেপ দিতে হবে। কি মনে হচ্ছিল জানো?

প্রবীর। কি মায়া?

মায়া। খালি মনে হচ্ছিল, এখুনি মরে যাবো—আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি তখন অফিসে, খবরও পেতে না। আচ্ছা, খুব কাঁদতে ত?

প্রবীর। জানো না মায়া? আমার কি আছে, তুমি আর এই বাচ্চা দুটো ছাড়া?

মায়া। সত্যি? হ্যাঁ, জানো, সুষমা কিন্তু ভারী ভালো মেয়ে। কি যত্নই করেছে আমার দিন-রাত! ও না থাকলে হয়ত এত শীগ্রী আমি সেরে উঠতে পারতাম না। বেচারীর জীবনটা ভারী দুঃখের, এত কষ্ট হয় শুনলে!

প্রবীর। তোমাকে বুঝি বলেছে সব?

মায়া। হ্যাঁ গো। ওর মা হলেন বামুনের মেয়ে, বারো বছর বয়েসে বিধবা হয়ে থাকতেন এক দূরসম্পর্কের মামার বাড়ীতে—বয়েস যখন সতেরো-আঠারো, সেই সময় ভাব হয় এক ফিরিঙ্গী সাহেবের সঙ্গে। বিয়ে ত আর হতে পারে না, তাই শেষটা পালিয়ে গেলেন। বছর তিনেক এক সঙ্গে ছিলেন —সেই সময় সুষমা হয়। তারপর সাহেব তাঁকে ফেলে পালালো। সুষমা যখন বছর দুইয়ের মেয়ে, তখন তাকে মিশন হোমে পাঠিয়ে ওর মা···

প্রবীর। আর একটি মক্কেল জুটিয়ে নিলেন?

মায়া। না গো না, আত্মহত্যা করলেন। ভাগ্যিস সুষমা মিশন হোমে

গিয়েছিল, তাই একটু লেখা-পড়া শিখে মানুষ হতে পেরেছে, দু-পয়সা রোজগার করছে।

প্রবীর। আর সেই সঙ্গে মায়ের ব্যবসাটাও ধরতে পেরেছে, না?

মায়া। যাঃ, কি যে বলো তার ঠিক নেই! ও সে-রকম মেয়েই নয়। আমার সঙ্গে ওর সব কথাই হয়েছে—কে একটি বিবাহিত লোক নাকি বৌকে হাঁসপাতালে দিতে এসে ওর প্রেমে পড়ে যায়, ওকে খুব দামী একটা নেকলেস প্রেজেণ্ট করে, আর বিয়েও করতে চায়। কিন্তু সুষমা শুধু বৌটার মুখ চেয়েই তাতে রাজী হতে পারে নি, নইলে লোকটিকে ও বেচারাও ভালো বেসে ফেলেছিল।

প্রবীর। হবে! হ্যাঁ, নেকলেসের কথায় মনে পড়ে গেল। তোমার নেকলেসটা মায়া ক'দিনের জন্যে একটু দীনবন্ধু বাবুকে দিয়েছি—উনি ঐ প্যাটার্ণের একটা গড়াবেন কিনা মেয়ের জন্যে। তুমি ত বাড়ী ছিলে না···

মায়া। মেয়ে? দীনবন্ধু বাবুর আবার মেয়ে এলো কোত্থেকে? ওঁর ত তিনটিই ছেলে!

প্রবীর। ভাইঝি, ভাইঝি, শীতলবাবুর মেয়ে—ঐ মেয়েই আর কি! হ্যাঁ, তা তোমার সুষমার প্রেমিকটি তাহলে ভাগলো শেষ পর্য্যন্ত!

মায়া। বলেছে ত তাই। কি রকম লোক দেখো ত! বৌ আছে, পাঁচ-ছ' বছরের একটা ছেলে আছে, আর একটা হতে গেছে—সেই লোক কিনা গিয়েছে আবার নূতন করে প্রেম করতে! মাগো, পুরুষ মানুষরা দেখছি সব পারে!

প্রবীর। সবাই পারে?

মায়া। কি জানি বাপু! তুমি যদি ওরকম করতে, তাহলে কিন্তু আমি ঠিক বিষ খেয়ে মরতাম। সত্যি বলছি!

প্রবীর। কেন? এত যাকে ভালোবাসো, তাকে খুসী করার জন্যে এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারতে না?

মায়া। রক্ষে করো, আর সব পারি, ওখানে ভাগ দিতে পারি না। স্বার্থপর বলো, বলতে পারো।

প্রবীর। কেন সুষমা ত আর একটা বৌ আছে জেনেই···

মায়া। সুষমা যে জানে, তার রূপের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, দু'দিনেই সে অজগরের মতো স্বামীকে ষোল-আনা টেনে নেবে। সত্যি অদ্ভুত রূপ, না? আর গুণও কম নয়! এমন মন কেমন করে আমার বেচারীর জন্যে!

প্রবীর। বেশ ত, তাহলে নিজের কাছেই এনে রাখো না। দিব্যি থাকবে দু-জনে!

মায়া। সর্ব্বনাশ! তাহলে দু'দিন পরে আমাকেই বিদেয় হতে হবে। তুমি এখন এমন আছো, তখন কি আর ঐ রূপের সাম্নে আমাকে মনে ধরবে?

প্রবীর। বুঝলাম! তা তোমার সুষমার প্রেমিকটি করেন কি?

মায়া। তোমাদেরই জাত-ভাই, উকিল। সুষমা বলেছে, আমাকে তাঁর ছবি দেখাবে। নাকি খুব সুন্দর দেখতে!

প্রবীর। দেখো মায়া, ভুলে যেয়ো না যে তুমি একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী, ভদ্রলোকের মেয়ে। একটা হাঁসপাতালের নার্স, তার কাছে উপকার পেয়েছো, কৃতজ্ঞ থাকো, কিন্তু অত ঘনিষ্ঠতায় কাজ কি তার সঙ্গে? তার ল্যাভার কি প্যারামার, কে কোথাকার একটা লোফার, তার ছবি তুমি দেখতে যাবে কি জন্যে?

মায়া। না, ও বলেছিল, তাই বলেছি।

প্রবীর। না ওসব বিশ্রী ব্যাপার ভালো নয় মায়া। আমি পছন্দ করি না একদম।

মায়া। ওমা, তুমি রাগ করলে!

প্রবীর। রাগের কথা হলেই রাগ করে লোকে!

[প্রবীর উঠে গিয়ে জানলার কাছে খবরের কাগজটা নিয়ে বসলো।

চাকর অম্বিকা এসে দাঁড়ালো, তারপর একটা প্যাকেট মায়ার হাতে দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। খুলতেই বেরুলো একটি নেকলেস, আর একখানি ফটোগ্রাফ। মায়া উঠে এলো প্রবীরের কাছে।]

মায়া। তুমি? তুমি?

প্রবীর। কি? কি?

মায়া। এ কার নেকলেস? কার ছবি? এতবড় বিশ্বাসঘাতক তুমি? এমন নির্লজ্জ! আমি তোমায় এতখানি বিশ্বাস করেছি, এত ভালোবেসেছি, আর তলায় তলায় তুমি আমার সঙ্গে এই রকম শয়তানী খেলেছো!

প্রবীর। আহা-হা, ব্যাপারটা তুমি আগে বুঝতে চেষ্টা করো মায়া।

মায়া। চুপ করো তুমি। কোন কথা শুনতে চাইনে তোমার। দু-জনে গলা ধরাধরি করে বসে ছবি তোলানো হয়েছে, নিজে হাতে তার গায়ে লেখা হয়েছে, 'আদরের সুষমাকে—প্রবীর', এর ভেতর আর বোঝাবুঝির কি আছে? ন্যাকামি পেয়েছো, না?

প্রবীর। তুমি সমস্তটাই ভুল বুঝছো মায়া।

মায়া। ঠিকটা তাহলে কি শুনি?

প্রবীর। পরে বলবো। এইটুকু শুধু জেনে রেখো যে যা ভেবেছো, মোটেই তা নয়। লক্ষ্মীটি মায়া, মাথা গরম করো না অমন শুধু শুধু!

মায়া। এই রইলো তোমার ঘর-বাড়ী, সংসার। আমি আজই চলে যাচ্ছি গোপালপুর। নৃপেন মজুমদার এখনো আমার আশা ছাড়েনি—এই সেদিনও হাঁসপাতালে এসেছিল দেখা করতে! তুমি যদি আমার সঙ্গে নেমকহারামি করতে পেরে থাকো ত আমিই বা তা করতে পারবো না কেন?

প্রবীর। খুন করবো, নেপাকে আমি খুন করবো।

মায়া। জেলে যেতে হবে তাহলে। আচ্ছা, এই পর্য্যন্তই! আমার গয়নাগাঁটি, জিনিষপত্র, সব আমি নিয়ে চললাম। ছেলে দুটোকেও নিয়ে চললাম

সেই সঙ্গে। থাকো তুমি, আর থাক তোমার সুষমা—আমি আর তোমাকে চাইনে। আমি তোমায় ঘেন্না করি।

প্রবীর। দয়া করো মায়া, দয়া করো। আমার কেউ নেই, কিছু নেই, তুমি ছাড়া।

মায়া। আহা রে আমার নেকুমণি!


বন-বেড়াল

[বালীগঞ্জের একটি সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়ী। ফুলবাগানের সংলগ্ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুরুট মুখে রায়বাহাদুর শশী দত্ত। সামে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী প্রেমানন্দ স্বামী। পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বের এক সকাল।]

রায়বাহাদুর। হাঁ। তুমি—আপনি—আপনি কে ?

প্রেমানন্দ। আমি ? কেউ না, পথিক।

রায়বাহাদুর। বেশ, তা পথ থাকতে ঘরে কেন ?

প্রেমানন্দ। সবই তাঁর লীলা। তিনি পথও সৃষ্টি করেছেন, আবার সেই পথের বাঁকে বাঁকে ঘরও বসিয়েছেন। যখন যেখান থেকে ডাক আসে।

রায়বাহাদুর। খুব ভালো কথা। কিন্তু নিজের ঘর ছেড়ে পরের ঘরে চড়াও করার বুদ্ধিটা কেন, শুনতে পাই কি ?

প্রেমানন্দ। যতদিন নিজেকে নিয়ে পড়েছিলাম, ততদিনই ছিল আত্ম-পর। যখনি তাঁর হাতে সঁপে দিলাম নিজেকে, তখনি সমস্ত দুনিয়া আপনার হয়ে গেল।

রায়বাহাদুর। বুঝলাম। তা শোনো বাবাজী, দুনিয়া কথাটা ছোট হলেও জিনিষটা খুব ছোট নয়। চেষ্টা করলে কোথাও-না-কোথাও দিব্যি আসর জাঁকিয়ে বসতে পারবে তুমি। ঢের আহম্মক আছে, যারা মনে করে, যোগেযাগে একবার তোমাদের কাছাটা ধরতে পারলেই এক হেঁচকা টানে সরাসরি বৈকুণ্ঠে গিয়ে উঠবে। সেই ভরসাতেই তারা তোমাদের মতো বজরুকদের গুরু বানিয়ে···

প্রেমানন্দ। অর্থাৎ···

রায়বাহাদুর। অর্থাৎ সোজা বাংলায়, তোমায় পত্রপাঠ এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। যদি ভালোয় ভালোয় না যাও, তাহলে তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।

প্রেমানন্দ। কিন্তু আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ আমার মন্ত্র-শিষ্য, আর পৌত্রী আমার···

রায়বাহাদুর। তাই নাকি? ক-দিন বাড়ী ছিলাম না, এর মধ্যেই এত কাণ্ড হয়ে গেছে! আচ্ছা করছি তার ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি বাছা আর দেরী করো না। চটপট সরে পড়ো তল্পিতল্পা গুটিয়ে।

প্রেমানন্দ। ওঁদের সঙ্গে দেখা না করে ত আমি যেতে পারি না। গুরু হিসাবে আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।

রায়বাহাদুর। ওঃ আচ্ছা। এই বাসুদেব, বৌমাকে ডাক ত একবার শীগ্রী।

প্রেমানন্দ। আর শ্রীমানকেও।

রায়বাহাদুর। কিছু দরকার নেই, কান এলে তার সঙ্গে মাথা আপনিই আসবে।

[মিলির প্রবেশ]

মিলি। কি বলছেন বাবা? কফি তৈরি করছিলাম আপনার।

রায়বাহাদুর। কফির চেয়ে কফিনের দরকারই আমার বোধহয় বেশী হয়ে উঠেছে বৌমা। তা এই কূর্ম্মাবতারটিকে রাতারাতি বাড়ীর ভেতর বহাল করার স্বাধীনতা তোমাদের কে দিলে শুনি?

প্রেমানন্দ। বলো মা, বলো, ক্ষোভের কিছু নেই। অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার প্রথমাবস্থায় প্রতিকূলতাই ত প্রত্যাশিত। আমি আশা করছি, অচিরেই ওঁকেও আমার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করতে পারবো।

রায়বাহাদুর। দেখা যাক বাবাজীর বৈরাগ্যের দৌড়টা। কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করছিলাম···

মিলি। ভেতরে আসুন বলছি।

প্রেমানন্দ। আচ্ছা আমিই না হয় তফাতে যাচ্ছি মা। এখনো কীর্ত্তনটা বাকী রয়েছে, সেটা সেরে নিয়ে তারপর স্নানে মনোনিবেশ করবো।

[প্রস্থান]

মিলি। উনি একজন সিদ্ধ পুরুষ। মস্ত বড় জমিদারের ছেলে, বেদান্তের স্কলার, দু-তিনবার ইউরোপ গেছেন, তারপর সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছেন।

রায়বাহাদুর। যেহেতু অন্যভাবে অন্নসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হচ্ছিল না। কিন্তু তোমরা ঐ চীজটি জোটালে কোত্থেকে ?

মিলি। মাঝখানে কি হয়েছিল বলি আপনাকে বাবা। আপনি ত ছিলেন না—হঠাৎ খুকু একদিন আমাকে বললে, সে নাকি ঈশান মাষ্টারকে ভালোবাসে। শুনে আমি ত লজ্জায় মরে যাই ! বললাম, সে কি রে ? এতবড় বাড়ীর মেয়ে তুই, এত লেখাপড়া শিখেছিস, তুই কিনা শেষকালে একটা চালচুলোহীন প্রাইভেট মাষ্টারকে বিয়ে করবি ? মেয়ের সেই ভীষ্মের পণ। উনি ত শুনে রেগেই আগুণ ! দিলেন সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ঈশানকে বিদায় করে। মেয়ে ত খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলে।

রায়বাহাদুর। ননসেন্স। ও বয়সে ওরকম হয়ই। কিন্তু এই গেরুয়া-পরা গণ্ডারটা এলো কি করে তার ভেতর ?

মিলি। বলছি বাবা। মেয়ের ভাব-গতিক দেখে উনি ভয়ানক মনের কষ্টে ছিলেন। সেই সময় একদিন মিঃ মজুমদারের বাড়ীতে হল বাবার সঙ্গে দেখা। আশ্চর্য্য যে বাবা ওঁকে দেখেই গড়গড় করে নাম-ধাম সব বলে দিলেন। এমন কি মেয়ের কাণ্ডকারখানা পর্য্যন্ত !

রায়বাহাদুর। আর তাতেই তোমরা একেবারে হাড়গোড় ভেঙে গড়িয়ে পড়লে বাবার শ্রীচরণে—না ?

মিলি। মেয়ের মন থেকে ঐ পাপ দূর করার আর ত কোন উপায় ছিল না বাবা। আপনি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন, উনি ক-দিনের মধ্যেই খুকুকে কি রকম অন্য মানুষ করে দিয়েছেন—দিনরাত্রি পূজো-আচ্চা, গীতা-পাঠ, আর গান-কীর্ত্তন নিয়েই মেতে আছে সে।

রায়বাহাদুর। সর্ব্বনাশ করেছো আর কি মেয়েটার! এর চেয়ে লোফার ঈশান মাষ্টারের সঙ্গে বিয়ে হলে ওর ঢের বেশী মঙ্গল হত—ঈশান আর যাই হক, ভদ্রসন্তান ত, আর লেখাপড়াও জানে। যাকগে, এখনো শোধরাও মেয়েকে, নইলে কিন্তু···

মিলি। না বাবা, ধর্ম্মের পথে যাচ্ছে মেয়ে, মা-বাবা হয়ে কি আমরা তাতে বাধা দিতে পারি কখনো?

[উত্তেজিত ভাবে নৃপেনের প্রবেশ।]

নৃপেন। মিলি, শীগ্রী এসো ত একবার।

মিলি। কেন, কেন? হয়েছে কি?

নৃপেন। খুকুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না—ঘরে না, ছাদে না, বাথরুমে না। কালীর মা'র মুখে শুনে সারা বাড়ী তোলপাড় করে খুঁজে এলাম। এখন উপায়?

মিলি। সে কি? সক্কাল বেলা ত কোথাও যাবার কথা নয়, যায়ও না ত কোন দিন। গাড়ী আছে ত গ্যারাজে?

নৃপেন। তা বোধহয় আছে।

রায়বাহাদুর। ধর্ম্ম-চর্চ্চার ফলটা তাহলে হাতে-হাতেই ফলে গেছে—অ্যাঁ? তা সেই দাড়িয়ালটা গেল কোথায়? শীগ্রী আটকাও সেটাকে, সেটাই নির্ঘাৎ আছে এর ভেতর। বাসুদেব!

নৃপেন। বাবা যেন কি! মহাপুরুষকে হাতে পেয়ে অপমান করার মতো মহাপাপ আর নেই। সেই ঈশান ব্যাটাই তলায় তলায় একটা কিছু করেছে।

রায়বাহাদুর। আরে হ্যাঁ, তাই ত বলছি আমি। তা বাসুদেব, কোথায় গেলি রে হারামজাদা?

[বাসুদেবের প্রবেশ।]

বাসুদেব। গাড়ী ত রয়েছে বাবু, লোকনাথ নেই। তার কাঠের বাক্সটাও উধাও হয়েছে গ্যারাজ থেকে!

মিলি। যা তুই এখান থেকে।

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ যা তুই, আর যাবার পথে স্বামীজীর ঘরে ছেকল তুলে দিয়ে যাস। যেন না পালায় সেটা।

নৃপেন। বাসু···

রায়বাহাদুর। খবদ্দার। যা শীগ্রী, ছেকল তুলে দিগে।

[বাসুদেবের প্রস্থান।]

মিলি। হায় হায়, আমি কোথায় যাবো গো? শেষটা ড্রাইভারের সঙ্গে! ছি-ছি এমন মেয়েও হয়েছিল আমার পেটে গো? এর চেয়ে যে ঈশান মাষ্টারও ভালো ছিল গো!

রায়বাহাদুর। সেই ঈশানই তোমার ঘাড় ভেঙেছে গো! আর মড়া-কান্না কেঁদে কি হবে গো?

নৃপেন। একটা ডায়েরি করে আসবো পুলিশে?

রায়বাহাদুর। কিচ্ছু করতে হবে না! ঐ বিঁটলেটাকে ধরে আনো এখানে, আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সব।

[সক্রোধে প্রেমানন্দের প্রবেশ।]

প্রেমানন্দ। নৃপেন্দ্র, আমি কি তোমার ভৃত্যের হাতে লাঞ্ছিত হতে এসেছি এখানে? সে কিনা আমায় ঘরে তালা দিয়ে রাখতে চায়!

নৃপেন। বাসু···

রায়বাহাদুর। চুপ। হ্যাঁ, এদিকে এসো ত তুমি। আমার নাৎনী কোথায়, বলো শীগ্রী।

প্রেমানন্দ। ব্যস্ত হবেন না। আত্মিক শক্তি বলে এখান থেকেই আমি সব

জানতে পেরেছি—গত রাত্রে প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় তিনি কোন কৃষ্ণবর্ণ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছেন এবং তার অল্প পরেই এক গৌরাঙ্গ ভদ্রবংশজাত শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে তাঁর শুভ পরিণয় হয়েছে, এই সহরেরই কোন সমৃদ্ধ পল্লীর একটি নিভৃত গৃহে!

নৃপেন। বিয়ে হয়েছে, অ্যাঁ? প্রভুর দৃষ্টি ত মিথ্যে হবার নয়! মিলি, তাহলে নিশ্চয় ঈশানই লোকনাথকে ঘুষ দিয়ে···

রায়বাহাদুর। নিশ্চয়। হারামজাদা শূওর কোথাকার! বের কর কোথায় রেখেছিস খুকুকে, নইলে এখুনি জুতিয়ে···

নৃপেন। আঃ, বাবা, ঈশান ত আর সাম্নে নেই যে···

[রায়বাহাদুর তড়াক করে উঠেই প্রেমানন্দের দাড়ি ধরে দিলেন এক টান। সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম চুলদাড়ি খসে গেল। সাধুটা আর কেউ নয়, স্বয়ং ঈশান।]

মিলি। অ্যাঁ?

নৃপেন। বাবা ত ঠিকই ধরেছেন! দাড়াও, শায়েস্তা করছি তোমায়।

রায়বাহাদুর। চুপ কর নেপা, জামাইয়ের সঙ্গে বুঝি ঐ রকম করে কথা বলে কেউ?

প্রেমানন্দ। দাদা মশায়, আমি গোড়াতেই বুঝেছিলাম, তোমার দয়ার শরীর। আমায় তুমি রক্ষা করো। ওঁরা নিশ্চয় আমায় পুলিশে দেবার চেষ্টা করবেন!

রায়বাহাদুর। ভয় নেই রে শালা, তোকেই আমি পুলিশের চাকরি দোব বরং। কিন্তু সে শালীকে লুকিয়ে রেখেছিস কোথায়?

প্রেমানন্দ। এই বাড়ীতেই, তে-তলার চিলে-কোঠায় আছেন। ভোরের মুখেই দু-জনে চলে এসেছি বিয়ে সেরে। তিনি আগে এসেছেন, তারপর আমি।

রায়বাহাদুর। লোকনাথ কোথায় গেল? তাকে একটা মোটা বখশিস দিতে হবে দেখছি।

প্রেমানন্দ। লোকনাথ? বখশিস?

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ রে শালা, তোর এজেন্ট লোকনাথ। তার কাছেই ত সব জানলাম ভোর বেলা। সে হাতে না থাকলে কি আর এত সহজে চোর ধরতে পারতাম? তা আর কি? যা তুইও তে-তলায়, সে শালী হয়ত মরছে একা-একা পেট ফুলে! [প্রেমানন্দের প্রস্থান।]

নৃপেন। বাবা এ বিয়েতে তোমার মত আছে?

রায়বাহাদুর। আমাদের মতামতের অপেক্ষা রেখেছে নাকি ওরা? এখন ভালো মানুষের মতো একটা হিন্দুমতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে ফেলো গে, তাহলেই···

মিলি। একটা কোথাকার কে!

রায়বাহাদুর। ওরে বেটী, জামাই করতে এর চেয়ে ভালো পাত্র আর পেতিস কোথায়? বুদ্ধিটা ত দেখলিই, বিদ্যেও কম নেই, কেম্ব্রিজের স্কলার—মেয়ে পড়াতে পড়াতে প্রেমে পড়ার তালে ছিল। সুযোগ বুঝেই খুকু লম্বা কাঁটায় গেঁথে তুলেছে শালাকে!

নৃপেন। রক্ষে হক বাবা!

মিলি। ভাগ্যিস, আর কিছু বলে বসো নি তুমি! যাহক, খুকুর কপালের জোর আছে। বলতো বটে সকলেই, ওর ভালো বিয়ে হবে!

রায়বাহাদুর। খুকুর কপালের চেয়ে ও-শালার বুদ্ধির জোরটাই বেশী, নইলে কি আর ঐ বন-বেড়াল এত সহজে বাঘের নাৎনীকে বের করে নিয়ে যেতে পারতো, তার খোঁয়াড় থেকে? ঐ যে এদিকেই আসছেন দু-জনে! আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হক। ওরে কে আছিস, উলু দে, উলু দে!

নৃপেন। বাবার কাণ্ড! চলো মিলি, আমরা সরে পড়ি এখান থেকে।


বেডিয়ট

[মাগনরাম ও মৈত্র মহাশয় মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে আলাপ করছেন। বেলা আন্দাজ আটটা। হাতের কাছে সকালের কাগজ এক গাদা মোচড়ান রয়েছে। এক কোণে টেলিফোন এবং তার পাশে লেখার সরঞ্জাম।]

মাগন। পরশু আপনহাকে পাঞ্চ হাজার দিয়েছে, আজ দিচ্ছে আউর পাঞ্চ হাজার। আপনহি হামার ফার্মের নামে একটু প্রপাগাণ্ডা ত কোরেন— দেখিয়ে লিবেন, হামি আপনহাকে বহুৎ খুসী কোরবে।

মৈত্র। আপনার দানের কথা ত সবাই জানে। দুর্ভিক্ষ-রিলিফের জন্যে আপনি লাখ লাখ টাকা জলের মতো খরচ করছেন, এ ত আমি লিখেইছি আমার ষ্টেটমেণ্টে।

মাগন। হাঁ, উ লিখা হামি পড়িয়েছে, উতে বহুৎ কাজ হইয়েছে। লেকেন, হামি চাই কি ফার্মের নাম ভি থাকবে পরবন্দমে। হামার ফার্মসে চার হাজার মন চাউর, আটা, আউর ঘিউ দিয়েছে ডেষ্টিচুটকে লিয়ে, দো বেল কাপড়া-উপড়া ভি দেবে, এহি রোকম কিছু লেখেন আপনহি, তোবে ত হামার কাম হোবে।

মৈত্র। আচ্ছা সে হবে খন, তার জন্যে ভাবনা কি? একটু কৌশল করে বলতে হবে, বুঝতেই ত পারেন, আমরা হলাম জনসাধারণের প্রতিনিধি. আর জনসাধারণ এখন আপনাদের ওপর খুসী নয়।

মাগন। হাঁ, সে ত হামি সমঝিয়েছে। কি জানেন? দেশের লোক ত বেওসা বুঝেনা, উরা বলে কি বেলাক মারকেট। আরে বাবু মোশায়, মাংগা বাজারমে ধান-চাউরের বেওসা করিয়েছে, মোটা নাফা করিয়েছে, ইতে ওন্যায়টা কি করিয়েছে? লেকেন, দেখেন ত কেত্তো পারসেণ্ট হামি খয়রাতি ভি কোরছে, কেত্তো লঙ্গরখানা খুলিয়েছে, আউর আসপাতাল দিয়েছে।

মৈত্র। বটেই ত, বটেই ত!

মাগন। বোলেন ত আপনহি, ই কি বেলাক মারকেট আছে? উরা

ই লিয়ে এত্তো গণ্ডগোল কোরছে কি হামার ফার্মের গুড-উইল বিলকুল নষ্ট হইয়ে যাচ্ছে। এখন আপনহাকে বাচাতে হোবে।

মৈত্র। আচ্ছা, আপনি বন্ধুলোক, যতটা পারি করবো, বুঝতেই ত পারছেন। তাছাড়া আপনি যখন আমার দেশের রিলিফ-কমিটির জন্যে এত টাকা দিলেন, তখন একটা কর্ত্তব্য ত এসেই পড়লো আমার ঘাড়ে।

মাগন। বেপার কি বুঝেন ? বাঙালী আউর ইন্দুস্তানীর ঝোগড়া আছে ইয়ের মধ্যে, আপনি একটু অল-ইণ্ডিয়া বেসিসে বুঝাইয়ে দেন লোকদের। বোলেন কি হামিভি জোন সাধারণের সেবাই কোরছে, তাকে রিলিফই দিচ্ছে!

মৈত্র। আচ্ছা, আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন, আমিও যথাসাধ্য করবো।

মাগন। উ হামাকে আর বোলতে হবে না। শনিচারসে হামি পরবন্দ আশা কোরবে। আচ্ছা রাম, রাম। [প্রস্থান। টেলিফোন বেজে উঠলো।]

মৈত্র। হ্যালো, হ্যাঁ আমি। পেয়েছি সব, দু-এক দিনের মধ্যেই পাব্লিক মিটিং কল করে দিচ্ছি বেটাদের সব জারী-জুরি ভেঙে। দুটো লঙ্গরখানা, আর চার খানা কাপড় বিলি দেখে লোকে ভুলতে পারে, আমাকে ভোলানো অত সোজা নয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বলতে হবে না! যত ব্যাটা মেড়ো ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার জুটেছে, ওদের আর এক মুহূর্ত্ত টলারেট করা উচিত নয় আমাদের। এখন বেঙ্গল ফার্ষ্ট, এছাড়া আর বাঁচবার উপায় নেই। ঠিকই ত, ঠিকই ত! হ্যাঁ একটা কথা, আর একটু উঠতে বলুন না ওঁদের—বড্ড কমে সারছেন, মস্ত বড় ব্যাপার ফাঁদিয়ে ফেলেছি দেশে, প্রায় তিরিশ হাজার লোককে খাওয়ানোর ভার নিয়েছি। বেশ, বেশ, বহু ধন্যবাদ!

[বুকুলালের প্রবেশ।]

বুকু। বাবা, তোমাকে এক ভদ্রলোক ডাকছেন। নীরোদবাবু না কি বললেন তাঁর নাম।

মৈত্র। নীরোদবাবু? অঃ বুঝেছি! তা তুই তাঁকে বলেছিস নাকি আমি বাড়ী আছি?

বুকু। না, বলেছি, ঠিক জানি না বাবা আছে কিনা। দেখে আসছি ভেতর থেকে।

মৈত্র। বেশ করেছিস। আচ্ছা যা বলগে, বাবা কাল রাত্রে জলপাইগুড়ি চলে গেছে, ফিরতে একটু দেরী হবে। তোর বড়দাকে বরং নীচেয় গিয়ে বুঝিয়ে বলতে বল, তুই গোলমাল করে ফেলবি। সব তাতেই তোর হাসির অভ্যেস!

বুকু। তুমি কিন্তু কথা বলো না বাবা। নীচে থেকে শোনা যাচ্ছে!

মৈত্র। আচ্ছা যা তুই। বৌমা? [বকুলালের প্রস্থান। সীমার প্রবেশ।]

সীমা। কি বলছেন বাবা?

মৈত্র। এত বেলা পর্য্যন্ত চা হয় না কেন? কি করো তোমরা সব? আর এই ছাই-ভস্ম মাজন গুলো কিনতে বলেছে কে তোমাদের?

সীমা। দিশি মাজন এর চেয়ে আর ভালো হয় না বাবা।

মৈত্র। দিশি মাজনই যে কিনতে হবে, এমন মাথার দিব্যি তোমাদের দিয়েছে কে? পয়সা দিয়ে জিনিষ নেবে, যা ভালো তাই নেবে, এর ভেতর দিশি-বিলিতির কথা আসে কি জন্যে?

সীমা। সে কি বাবা? আপনি না একজন পেট্রিয়ট! আপনার বাড়ীতে বিলিতি জিনিষ ঢুকলে লোকে বলবে কি?

মৈত্র। ননসেন্স! লোকে কি তোমার হাঁড়ির ভেতর উঁকি দিতে আসছে?

সীমা। কেউ জানতে না পারলেই বা। একটা আদর্শের ত দাম আছে!

মৈত্র। উঃ, এই সব চোখা কথা বুঝি তোমার বাবার কাছে শিখেছো? যে লোক বিশ হাজার টাকার প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে খামখা একটা লোফার সাজতে পারে, তার মতো নির্বোধের···

[সবেগে বুকুলালের প্রবেশ।]

বুকু। বাবা বাইরের ঘরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কেউ বলছে, চোর, কেউ বলছে জোচ্চোর! বলছে, জোর করে বাড়ীর ভেতর ঢুকবো— জিনিষপত্র টেনে নিয়ে যাবো।

সীমা। ওমা সে কি? সামন্ত গ্রুপের লোক বোধহয়। আমি তখনি বলেছিলাম বাবা, গবর্ণমেন্টের হয়ে ওদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন করবেন না অমন করে। ওরা ডেসপারেট!

মৈত্র। থামো, থামো। সব কথায় তোমার কাজ কি বলো ত? যাও, রান্নাঘরে যাও। [সীমার প্রস্থান।] বোকা, তা তুই বলিস নি ত বাবা বাবা বাড়ী আছে?

বুকু। না বাবা। কিন্তু তুমি গেলেই ভালো হত, ওরা যদি…

মৈত্র। জ্যাঠামো করিস নে। বড়দা কোথায়?

বুকু। বড়দা বাইরের ঘরে, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করছে। শুনতে পাচ্ছো না, ঐ ত বড়দার গলা!

মৈত্র। আচ্ছা যা তুই, তোর বৌদির নাম করে তাকে একবার ভেতরে আসতে বল।

বুকু। এই ফাঁকে ওরা যদি…

মৈত্র। যা তুই, তর্ক করিস নে। [বুকুলালের প্রস্থান।]

[মৈত্র একটা চাদরে মাথা থেকে থুৎনি পর্য্যন্ত জড়িয়ে নিলেন, তারপর বারান্দা দিয়ে উঁকি মেরে সদর রাস্তাটা দেখলেন। দেখলেন, অনেক লোক জমে গেছে, বেশ হট্টগোল হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ভেতরে এসে চেয়ারে চেপে বসলেন। উপেনের প্রবেশ।]

উপেন। বাবা, টুনটুন রামের লোক এসেছে বেলিফ সঙ্গে করে,

বাড়ীওয়ালা এসেছে ইজেক্টমেণ্টের নোটিশ নিয়ে। বলছে, আজ ওয়াদার শেষ দিন, পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে না দিলে মালপত্র ক্রোক করবে।

মৈত্র। হুঁ। আর কে এসেছে?

উপেন। দাশুগয়লা এসেছে, পরাণ স্যাকরা এসেছে, ডালওলা এসেছে, ছিট-কাপড়েওয়ালা এসেছে। সবাই বলছে, আজ ওয়াদার শেষ দিন। না যদি দেন, একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো।

মৈত্র। বটে? আচ্ছা, করুক শালারা কি করবে। বলো গে তুমি, বাবা বাইরে গেছে, ঘরে একটি আধলা নেই। আপনারা যা পারেন করুন, আমরা কোন কিছুতেই বাধা দোব না।

উপেন। এটা কি ভালো হবে? পাড়ার লোকের কাছে একটা মান-সম্ভ্রম আছে ত। তার চেয়ে আমি বলি কি, সকলকেই কিছু কিছু…

মৈত্র। চুপ করো ত বাপু, তোমাকে আর সুপরামর্শ দিতে হবে না। যা বলছি, তাই করো গে, তারপর আমি বুঝবো!

উপেন। ছি-ছি, এ সব কি কাণ্ড! [প্রস্থান। বিব্রত মুখে সীমার প্রবেশ।]

সীমা। বাবা, সর্ব্বনাশ হল, মান-সম্ভ্রম সব গেল। ওরা বাইরের ঘরের টেবিল, চেয়ার, আলমারি, সব রাস্তায় টেনে নামাচ্ছে, বই-পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, কাপ-ডিস ভাঙছে, আর যাচ্ছেতাই বলে গাল দিচ্ছে!

মৈত্র। আচ্ছা, আচ্ছা, হচ্ছে তার ব্যবস্থা, অত ব্যস্ততার কি আছে?

[সীমার প্রস্থান।]

[মৈত্র পাগড়ী জড়িয়ে বারান্দায় উঠে এলেন। দেখলেন রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, তারি ভেতর তাঁর পাওনাদাররা মালপত্র টেনে নামাচ্ছে। জনতার ভেতর থেকে কেউ বলছে, 'জোচ্চোর', কেউ বলছে, 'বিনা পয়সার বড়লোকী, যত জুটেছে কলকাতায়!' মৈত্র নিঃশব্দে সব লক্ষ্য করলেন, তারপর দোতলার বারান্দা থেকে তারস্বরে বক্তৃতা সুরু করলেন।]

মৈত্র। বন্ধুগণ, আমার এই দুর্দ্দশা দেখে আপনারা হয়ত আমোদ পাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা জানেন কি, আমি কে? কেন আজ আমার এই দুর্গতি? শুনলে নিশ্চয় আপনারা ব্যথিত হবেন। আমিই বঙ্গ-জননীর দীন সেবক ফণী মৈত্র, যাকে রাজ-রোষে এ পর্য্যন্ত দশ বার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে, নির্য্যাতন ও দারিদ্র্যের মধ্যেই যে আজীবন সত্য এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। আমার কিছু নেই, এক দেশ-জঁননীর পায়ে উৎসর্গীকৃত এই প্রাণটা ছাড়া! ঋণ আমি করেছি অভাবের তাড়নায়, যথাশক্তি পরিশোধও করে যাচ্ছি, কিন্তু এককালে সব শোধ করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই— তাই, তাই আজ ওঁরা আমার ঘটী-বাটী, বিছানা-মাদুর সব কিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের কাছে দেশের সেবক, আপনাদের সেবক হিসাবে আমি সুবিচার চাই। আমি বৃদ্ধ, আমি অসুস্থ, আপনারাই সুবিচার করুন। [অদৃশ্য।]

জনতা। ধরো ধরো! মারো শালাদের!

পাওনাদার। মশায়রা, আমাদের···

একজন। চোপ শালা, একটা এতবড় পেট্রিয়ট, তোমরা এসেছো তার মালপত্র ক্রোক করতে?

আর একজন। শালা, পেট্রিয়টের মালে হাত! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

প্রথম পাওনাদার। মশায়রা আমরা ওঁর কাছে অনেকগুলো টাকা পাবো। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, এই করে আজ এক বছর ঘোরাচ্ছেন!

একজন। পাবিনা, এক পয়সাও পাবিনা। নে ত কি করে নিবি তোরা! এই রইলাম আমরা এখানে দলবল নিয়ে।

দ্বিতীয় পাওনাদার। সাত মাসের ওপর আমাকে একটি পয়সাও ভাড়া দেন নি স্যার, অথচ উঠেও যাবেন না বাড়ী থেকে!

আর একজন। সাত মাস? সাত বচ্ছর থাকবে বিনা ভাড়ায়, কি করবি কর ত তুই!

পাওনাদাররা। বাঃ, এ ত আপনাদের বেশ জুলুম! আমরা টাকা পাবো, আর আমরাই হলাম দুষী?

তৃতীয় ব্যক্তি। দুষী না? আলবৎ দুষী। দেশের জন্যে যে সর্ব্বস্ব দিয়েছে, তাকে তোমরা এই ক'টি টাকা ছেড়ে দিতে পারো না?

সকলে। আর কথা নয়, মারো শালাদের। জয় হিন্দ! বন্দে মাতরম!

[মার আরম্ভ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে চীৎকার, 'তোল মাল', 'শীগ্রী, ঘরে তোল', 'জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো' ইত্যাদি। পাওনাদাররা ধরাধরি করে মাল ঘরে উঠাতে লাগলো। মৈত্র চেয়ারে বসলেন। সীমা চা ও জলখাবার নিয়ে সামে এসে দাঁড়ালো।]

মৈত্র। হ্যাঁ, কি বলছিলে তুমি? সামন্ত গ্রুপ—না? বেশ বুদ্ধিটা বের করেছিলে অবশ্য। আচ্ছা এক কাজ করো ত, ইউনিভার্স্যাল এজেন্সী Calcutta 5541-এ একটা কনেকশন নাও ত, দিয়ে দিই একটা খবর চালু করে।

সীমা। Calcutta 5541 Please! হ্যালো, ইউনির্ভাস্যাল এজেন্সী? দেশমান্য ফণী মৈত্র মহাশয় কথা বলছেন। এই নিন বাবা।

মৈত্র। হ্যালো, কে ত্রিবেদী? আমি, হ্যাঁ শোনো, একটা খবর করে দাও ত দাদা। আজ সকালে সামন্ত গ্রুপের একদল ছোকরা লাঠি ও লোহার ডাণ্ডা নিয়ে আমার বাড়ী আক্রমণ করে, জিনিষপত্র ভেঙে চুরে তছনছ করে দেয়—মেয়েদের পর্য্যন্ত অপমান করতে চেষ্টা করে। অবশেষে পাড়ার দেশ-প্রেমিক ছাত্রদল জড়ো হয়ে তাদের অপসারিত করে দেয়। তার ফলে কয়েকজন অল্প আহত হয়। হ্যাঁ, হেডিং দাও 'দেশসেবকের লাঞ্ছনা'—সব কাগজেই পাঠিয়ো খবরটা। আচ্ছা, আচ্ছা!

সীমা। অজবল মিথ্যে খবর ছাপাবেন?

মৈত্র। আরে খবর মানেই মিথ্যে, মধ্যে থেকে যদি কিছু বৈষয়িক সুবিধা

হয়ে যায়, মন্দ কি? কি জানো বৌমা, সবই হল ট্যাক্টের কথা। সংসারে ও ভিন্ন এক পা চলার জো নেই!

সীমা। কিন্তু লোকে ত জানলো আসল ব্যাপার!

মৈত্র। ক'জন জানলো? তাছাড়া যারা জানলো, তারাই যে ঠিক জানলো, তার প্রমাণ কি? লোককে বোকা-বোঝানোতেই ত লীডারসিপের সত্যিকার এক্সেলেন্স!

সীমা। জলখাবার খেয়ে নিন, জুড়িয়ে যাবে।

মৈত্র। হ্যাঁ, নিই। আমায় আবার বেরুতে হবে, মিটিং আছে দেশবন্ধু পার্কে—ডাইভোর্স বিলের সম্পর্কে আলোচনা।

সীমা। ডাইভোর্স আপনি সাপোর্ট করেন?

মৈত্র। করি পাবলিক-অপিনিয়ন হিসাবে, ঘরোয়া মত হিসাবে নয়!



রমা। না ছোড়দা, ওসব চালাকিতে ভুলছি না। তোমাকে বলতেই হবে আসল ব্যাপারটা কি?

রমেন। আসল ব্যাপার এই যে সবিতাকে আর আমি ভালোবাসি না, তাকে আর আমি চাই না।

রমা। তবে এতদিন ভালোবাসার অভিনয় করলে কেন তার সঙ্গে?

রমেন। অভিনয় নয়, তখন ওটা সত্যি ছিল। এখন যদি অন্তরে ভালো না বেসেও বাইরে ভালোবাসার ভাণ করি, তাহলেই হবে অভিনয়। তা আমি করতে চাই না বলেই ত তাকে ছেড়ে চলে এসেছি!

রমা। কিন্তু এ ত এক পক্ষের ব্যাপার নয় ছোড়দা যে তুমি মুক্তি দিলেই চুকে যাবে? তার দিকটাও ত দেখতে হবে। সে যদি তোমায় ছেড়ে দিতে না পারে, কিংবা না দিতে চায়, তাহলে তুমি চলে আসবে কোন অধিকারে?

রমেন। নিজের শান্তি ও স্বার্থের অধিকারে। কথাটা শুনতে হয়ত সুশ্রী নয়, কিন্তু এটাই সত্য কথা রুমী।

রমা। বেশ, কিন্তু এই যদি তোমার সত্যি কথা, তবে তার গয়না গুলো কেন তুমি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এসেছো?

রমেন। নিয়ে আমি আসিনি রুমী, আর ফাঁকি দিয়ে ত নয়ই। সবিতা বলেছিল, আমার চেয়ে পৃথিবীতে তার কিছুই প্রিয় নয়—তারি পরীক্ষা হিসাবে আমি চেয়েছিলাম তার গয়নাগুলো। নিজের ইচ্ছায় সে দিয়েছিল আমাকে, বলেছিল, বেচতে, বাঁধা দিতে, ফেলে দিতে, যা খুসী তাই করতে পারি আমি সেগুলো নিয়ে, সে ফিরেও চাইবে না, ভুলেও···

রমা। বুঝলাম। কিন্তু সেই তুমিই যখন তার হলে না, তখন যে-বিশ্বাসের ওপর সে তার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল, তার সুযোগ নিলে কি করে? এটা কি প্রতারণা নয়?

রমেন। আহা, তুই কথাটা বুঝিস না কেন রুমী? সেদিনকার অধ্যায়ে

আমার ভালোবাসাটাও ছিল যেমন সত্যি, তার ওপর নির্ভর করে তার সর্ব্বস্ব দেওয়াটাও ছিল তেম্নি সত্যি। সেদিনের লেন-দেনকে আজকের ম্যাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে ত জিনিষটা চুরিই হবে রুমী. কিন্তু সেদিন ত আমি চুরি করিনি!

রমা। থামো ছোড়দা, চুরির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে হবে না তোমায়। সোনা জিনিষটা যদি তোমার ভালোবাসার মতো হাওয়াই মাল হত, তাহলে কথা ছিল না—কিন্তু মনে রেখো, তার ভরি একশো টাকার ওপর! তোমাকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসে বলেই সবি কোন কথা এখনো কারুকে জানায় নি। যদি জানায়, তাহলে কি হবে আন্দাজ করতে পারো?

রমেন। পারি বৈকি! বড় জোর জেল হবে। কিন্তু তাতেই কি সবিতার ভালোবাসার ক্ষিধে মিটে যাবে?

রমা। তা যাবে না, তবে গয়না গুলো ত সে ফিরে পাবে।

রমেন। তাও পাবে না।

রমা। কেন? সত্যি-সত্যিই তুমি গয়নাগুলো বিক্রী করেছো, না বন্ধক দিয়েছো?

রমেন। কিছুই করি নি, মিলিকে দিয়েছি।

রমা। মিলি? সে আবার কে?

রমেন। আছে এক জন। সকলেই তাকে চেনে অন্য নামে, মিলি আমার দেওয়া নাম। হাসিস নে রুমী, হেসে ওড়াবার মতো মেয়ে সে নয়!

রমা। বেশ, বেশ, তা এটি জোগাড় হল কোত্থেকে?

রমেন। বলছি দাঁড়া।

[দিলীপের প্রবেশ।]

দিলীপ। বৌদি, আমি একটু বেরুচ্ছি। ফিরতে হয়ত দেরী হবে। আ-রে ছোড়দা যে, তা কেমন আছেন?

রমেন। আছি এক রকম। তোমার খবর কি?

দিলীপ। খবর আর কি বিশেষ? একটা চুক্তি-ভঙ্গ বনাম বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা নিয়ে ব্যস্ত। তারি ধান্দায় সিনিয়ারের বাড়ী যেতে হচ্ছে এই ভর সন্ধ্যে বেলা।

রমেন। বসো, বসো, শোনাই যাক একটু ব্যাপারটা।

দিলীপ। ব্যাপার হল সেই পুরানো প্রেম ও তার পরিণাম। 'চোখের জল' না কি একটা বইয়ের নায়িকা প্রমীলা বালা—তাকে দেখে, কুঙ্কমগড়ের প্রিন্স আনোয়ার ত পাগল হলেন, এমন পাগল যে পনেরো দিনেই প্রেম, বিবাহ, বাড়ী-গাড়ী ও ধনরত্ন দান সমাধা হয়ে গেল। তারপরই শ্রীমান টের পেলেন, তিনি আপাদমস্তক ঠকেছেন—প্রমীলার বয়স কম করেও আট-চল্লিশ, দুপাটি দাঁতই বাঁধানো, গায়ের রং মিশকালো, মেক-আপের কৌশলে তাকে তরুণী ও সুন্দরী দেখায়, আসলে সে বুড়ী ও বেহদ্দ কুৎসিত!

রমা। বলো কি? এ যে দেখছি খাসা নাটক!

দিলীপ। নাটকই ত! নাটক কি আর মাটি ফুঁড়ে ওঠে বৌদি? জীবন থেকেই ত জন্মায় নাটক-নভেল। যাই হক, প্রিন্স তখন আর করেন কি? একদিন পেট ভরে মদ খেয়ে এসে, প্রিয়তমার পৃষ্ঠদেশে আচ্ছা করে করলেন পায়ের জোর-পরীক্ষা, তারপর মক্কেল-মোসাহেবদের হাত দিয়ে যতটা পারলেন মালপত্র ছিনিয়ে নিয়ে কুঙ্কমগড়ে পাড়ি জমালেন। প্রমীলা তখন কায়দা পেয়ে করলেন চুক্তি-ভঙ্গ ও খোরপোষের দাবীতে মামলা দায়ের, সেই মামলাই কণ্ডাক্ট করছেন আমার সিনিয়ার নিশাপতি বাবু।

রমা। তারপর?

দিলীপ। তারপর আর কি? প্রমীলার কিছু টাকা-পয়সা ও বাড়ী-গাড়ী প্রাপ্তি হল, প্রিন্সেরও কিছু নগদ শিক্ষা লাভ হল। এরপর যাহক একটা নিষ্পত্তি হবেই। আমরাও দু'টাকা পেয়ে যাবো এই দ্বৈরথ যুদ্ধের হিড়িকে।

রমা। প্রমীলাকে তুমি দেখেছো ঠাকুরপো ?

দিলীপ। দেখেছি বৈ কি! ব্রহ্মচর্য্যে মতি দৃঢ় হবার পক্ষে মজবুত চেহারা! বেন্দার মাকে মনে পড়ে তোমার বৌদি? অনেকটা তারি মতো। কিন্তু এরি মধ্যে আবার একটি নূতন রোমান ন্যাভেরো তাঁর পিছু নিয়েছেন বলে শুনলাম। সিনেমা-ষ্টার বলে কথা! ওহো, এদিকে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে—আমি আর দেরী করবো না বৌদি, আমাকে যেতে হবে সেই খাল-পারে। আচ্ছা, চলি ছোড়দা। [প্রস্থান।]

রমা। দিলু ঠাকুরপো বেশ গল্প করে! তা বলো ছোড়দা এবার তোমার কাহিনী।

রমেন। কাহিনীর সুরুটা তোকে বলেছি, অপ্রত্যাশিত ভাবেই তার শেষটা জুগিয়ে দিয়ে গেল দিলীপ। আমার মিলি হলেন ঐ 'চোখের জলের' নায়িকা প্রমীলাই। ধরণীর ষ্টুডিয়োতে আলাপ, তাথেকেই প্রেম ও আনুষঙ্গিক···

রমা। অ্যাঁ?

রমেন। হ্যাঁ রে! এখন বুঝতে পারছি, শুধু প্রিন্স আনোয়ার হোসেনই বেকুব হয়নি, হয়েছি আমিও—শ্রীমান হনুমানদাস বাঙালী! বয়স আট-চাল্লিশ, দু-পাটি দাঁত বাঁধানো, মিশ কালো রং—বাপস! [আলমারির পেছন থেকে হঠাৎ একটা খিক-খিক শব্দ শোনা গেল।] ও কি, কিসের শব্দ রে?

রমা। তাই ত, হাসির শব্দ মনে হল যেন! একটু উঠে দেখো না ছোড়দা, জানো ত আমার ভূতের ভয় কি রকম!

রমেন। [উঠে গিয়ে] অ্যাঁ, সবিতা, তুমি এখানে? সব শুনছো তাহলে? রাণু, লক্ষীটি, এবারের মতো আমায় মাপ করো, আর কক্ষণো আমি···

সবিতা। আঃ? কি হচ্ছে ওসব ছোট বোনের সাম্নে? পা ছেড়ে দাও। তোমার মাথা খারাপ হয়ে থাকতে পারে, আমার ত হয় নি!

রমা। অম্নি গলে গেলি সঙ্গে-সঙ্গে? বলেছিলাম না একটু শক্ত হয়ে থাকতে! তা শোনো ছোড়দা, সবি যাই বলুক, ওর গয়না গুলো কিন্তু গড়িয়ে সাত দিনের মধ্যেই হাজির করবে, নইলে আমি···

সবিতা। তুই ক্ষেপেছিস রুমী? কে গয়না দিতে গেছে ওকে? আমি তখনি বুঝেছিলাম, ও কারো খপ্পরে পড়েছে, তাই গয়না চাইছে, হারুকে দিয়ে এক সেট গিল্টীর গয়না আনিয়ে সোজা সোনার বলে চালিয়ে দিয়েছি। জানতাম ওরি ধাক্কায় থোতা মুখ ভোঁতা করে ফিরে আসতে হবে একদিন—সেদিনটা একটু তাড়াতাড়ি এসে গেল, এই যা।

রমা। বলিস কি? তুইও ত কম খেলোয়াড় নস!

সবিতা। তাহলে কি আর তোর এই সুপার-খেলোয়াড় দাদাটিকে গাঁথতে পারতাম কোন দিন? তা তুই ভাই একটু চা কর ত! আলমারির পেছনে ঘণ্টা খানেক ঘাপটি মেরে থেকে আমার হাঁপ ধরে গেছে, চা না হলে আর চাঙ্গা হতে পারছি না!

রমেন। হ্যাঁ, একটু চা···

[সবিতা ও রমা হো-হো করে হেসে উঠলো তার কথায়।]